ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪১
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৫

ফাত্ওয়া প্রদানের নীতিমালা ও শর্তাবলি : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের রায়

মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান*

[সারসংক্ষেপ : *কোন বিষয়ে ইসলামী বিধান জানার নিমিত্তে ফাত্ওয়া দেয়া-নেয়া মুসলিম সমাজের মৌলিক একটি বিষয়। যারা জানে না তাদেরকে যারা জানে তাদের নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়ার জন্য কুরআন কারীমে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে মুফতীর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা অতীব জরুরী। সম্প্রতি ফাত্ওয়া নিয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের রায়ের পূর্ণাঙ্গ কপি আপিল বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। ফাত্ওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের বিবেচনায় সুপ্রিমকোর্টের রায়ের পাশাপাশি ফাত্ওয়া সংশ্লিষ্ট আলোচনা নিয়ে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে, যা উপর্যুক্ত রায় বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ফাত্ওয়ার পরিচয়, গুরুত্ব, সংবেদনশীলতা, ফাত্ওয়া প্রদানকারীর যোগ্যতা, ফাত্ওয়া প্রদানের নিয়ম-নীতি ইত্যাদি বিষয় বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে পর্যালোচনা ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজনের নিরিখে সারণি এবং চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন, হাদীস, এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট মৌলিক গ্রন্থাবলি তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সময়ের আবর্তনে সংঘটিত ফাত্ওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা ও দুর্ঘটনা বাংলাদেশের জনসমাজে ফাত্ওয়ার ব্যাপারে যে ভয়-ভীতি কিংবা ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে, তা দূরীকরণে এ প্রবন্ধ সহায়ক ভূমিকা রাখবে। সহজ ও সাবলীলভাবে ইসলামের বিধান জানিয়ে দেয়ার মাধ্যমে মানব সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করা যে ফাত্ওয়া প্রদানের মূল লক্ষ্য, এ প্রবন্ধ পাঠে পাঠক তা অনুধাবন করতে পারবেন।]*

মূলশব্দ : ফাত্ওয়া, জনকল্যাণ, নীতিমালা, শর্তাবলি, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট।

১. ভূমিকা

ফাত্ওয়া (Formal and legal opinion) বলতে মূলত কোন প্রশ্ন কিংবা ঘটনার প্রেক্ষিতে মুসলিম আইনবিদ প্রদত্ত বিধান বা সমাধানকে বুঝানো হয়ে থাকে।[১]

* পিএইচ.ডি গবেষক, ফিক্হ ও উসূল আল-ফিক্হ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া।

১. মুহাম্মদ রাওয়াস কাল'আজী, এবং হামিদ সাদিক ক্বানিবী, *মু'জাম লুগাত আল-ফুক্বাহা*, বৈরূত : দারুন নাফায়িস, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ২৫৪ (আল-ফাতওয়া)

الحكم الشرعي الذي يبينه الفقيه لمن سأله عنه

ফাত্ওয়ার আদান-প্রদান মুসলিম সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য একটি বিষয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাসম্ভব ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলতে প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তি বাধ্য। এ ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের ইসলামী বিধান জানা না থাকলে তাকে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হতে হবে এবং তাদের প্রদত্ত ফাত্ওয়া অনুযায়ী নিজের কাজকর্ম সম্পাদন করতে হবে। ফাত্ওয়ার পরিধি অনেক ব্যাপক। জীবন দর্শন থেকে শুরু করে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সকল বিভাগেই রয়েছে এর বিচরণ। সাধারণত ফাত্ওয়াকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক: ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কিত, যা ইবাদাত, পারস্পরিক লেন-দেন ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে ব্যক্তি পর্যায়ে সীমিত এবং তা রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে কোনরূপ সাংঘর্ষিক নয়। দুই: আইন ও দণ্ডবিধি সম্পর্কিত, যা সরকার, সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়।[২]

মহানবীর স. (মৃ. ১১ হি.) যুগ হতেই ফাত্ওয়ার সূচনা হয়। বিভিন্ন ঘটনা কিংবা প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ স. আল্লাহ প্রদত্ত ওহী, ইলহাম এবং কখনো নিজস্ব ইজতিহাদের মাধ্যমে ফাত্ওয়া দিতেন। রাসূলের স. উপস্থিতিতে এবং পরবর্তীতে তাঁর তিরোধানের পরে সাহাবীদের মধ্যেও ফাত্ওয়া প্রদানের রীতি প্রচলন ছিল। ইবনু উমর রা. (মৃ. ৭৩ হি.)কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূলের স. যুগে আবু বকর রা. (মৃ. ১৩ হি.) এবং উমর রা. (মৃ. ২৩ হি.) ফাত্ওয়া দিতেন। কাসিম ইবনে মুহাম্মদ বলেন : রাসূলের স. সময়ে আবু বকর, উমর, উসমান (মৃ. ৩৫ হি.) ও আলী (মৃ. ৪০ হি.) রা. প্রমুখ ফাত্ওয়া দিতেন।[৩] তবে উল্লেখ্য যে, সাহাবীদের মধ্যে যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন, তিনি সে বিষয়ে ফাত্ওয়া দিতেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন:

> من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب و من أراد أن يسأل عن الحلال و الحرام فليأت معاذ بن جبل و من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت و من أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإني له خازن.
>
> তোমাদের মধ্যে যে কুরআন সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন করতে চায়, সে যেন উবাই ইবনে কা'বকে (মৃ. ৩০ হি.) জিজ্ঞেস করে, যে হালাল-হারাম সম্পর্কিত প্রশ্ন করতে চায় সে যেন মু'য়ায ইবনে জাবালকে (মৃ. ১৮ হি.) জিজ্ঞেস করে, যে মীরাসের বিধান জানতে চায় সে যেন যায়েদ ইবনে সাবিতের (মৃ. ৪৫ হি.)

২. প্রফেসর ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, আল-ইফতা : একটি পর্যালোচনা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : *জার্নাল অব আর্টস এন্ড হিউম্যানিটিজ*, জুন ১৯৯৯, খ. ১৫, পৃ. ১২৫

৩. আবদুর রায্যাক আবদুল্লাহ সালিহ আল-কিনদী, *আত-তাইছীর ফিল ফাতওয়া, আসবাবুহু ও দাওয়াবিতুহু*, বৈরূত : মুয়াছ্ছাছাত আল-রিসালাহ, ২০০৮, পৃ. ৩৩

শরণাপন্ন হয় এবং যে ধন-সম্পদ সম্পর্কিত প্রশ্ন করতে চায় সে যেন আমার নিকট আসে; কারণ আমি হচ্ছি এর তত্ত্বাবধায়ক।[৪]

সাহাবীদের পরবর্তী যুগে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ অনুসারীগণ ফাত্ওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন। এ যুগে আল-ইফতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এ যুগে তাবি'ঈগণ মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা, সিরিয়া, মিসর ও বাগদাদ ইত্যাকার প্রশাসনিক অঞ্চলগুলোতে ফাত্ওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন।[৫] এ ধারাবাহিকতায় ফাত্ওয়া প্রদানের কার্যক্রম চলতে থাকে। প্রতিটি যুগে সে সময়কার বড় মুজতাহিদ এবং অভিজ্ঞ মুসলিম আইনবেত্তাগণ ফাত্ওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে সময়ের আবর্তনে ইসলামী খিলাফতের পতন এবং ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণে ফাত্ওয়া প্রদানের কার্যক্রম সরকারী প্রতিষ্ঠানের পদমর্যাদা হারিয়ে বেসরকারী পর্যায়ে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে আসে।[৬] কিন্তু আশার কথা হচ্ছে, বর্তমানে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ এবং জ্ঞানের অনেক সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করার পরিপ্রেক্ষিতে দু'এক ব্যক্তির পক্ষে সকল বিষয়ে ফাত্ওয়া দেয়া অনেকাংশে অসম্ভব হয়ে পড়ার কারণে ফাত্ওয়া প্রদান আবার তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ফিরে পেতে শুরু করেছে। বর্তমানে ব্যক্তিগত ইজতিহাদের চেয়ে সামষ্টিক ইজতিহাদের কার্যক্রম জোরদার হচ্ছে। সামষ্টিকভাবে ফাত্ওয়া দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে ইতোমধ্যে ফিক্হ একাডেমি, ফাত্ওয়া কাউন্সিল ইত্যাদি গড়ে উঠেছে, সম্মিলিতভাবে অর্জিত সমাধান লাভের আশায় দেশে-বিদেশে ফিক্হী সেমিনার, কনফারেন্স আয়োজন করা হচ্ছে এবং সর্বোপরি বিশ্বের অনেক দেশে ইফতাকে সরকারি প্রতিষ্ঠানের রূপ দিয়ে এর জন্য প্রশাসনিক এবং আর্থিক বাজেট বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে।

২. সুপ্রিমকোর্ট প্রদত্ত রায়ের প্রেক্ষাপট ও সংক্ষিপ্তসার

অযোগ্য ও অদক্ষ ব্যক্তিদের প্রদত্ত ফাত্ওয়া বাংলাদেশের জনজীবনে সময়ে সময়ে বিভিন্ন ঘটনা ও দুর্ঘটনার জন্ম দিয়ে থাকে। এ রকম একটি দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে "শহীদা" নামের গ্রাম-বাংলার এক গৃহবধু। ২০০০ খ্রি. সালে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, তার স্বামী তাকে ডিভোর্স দিয়েছিল, পরবর্তীতে স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনতে চাইলে স্থানীয় মুফতী ফাত্ওয়া দেন যে, এ জন্য তাকে

৪. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাকিম আল-নিসাবুরী, *আল-মুসতাদরাক আলা আস্-সাহীহাইন*, অনুচ্ছেদ : যিক্র মানাক্বিব আহাদিল ফুকাহা আস-সিত্তাহ মিনাস্-সাহাবাহ, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তাহকীক: মুস্তফা আবদুল কাদির, ১৯৯০, খ. ৩, পৃ. ৩০৪, হাদীস নং ৫১৮৭। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, যদিও তারা তাদের গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করেননি।

৫. ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, আল-ইফতা : একটি পর্যালোচনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

অবশ্যই তৃতীয় কোন ব্যক্তির বিবাহোত্তর ডিভোর্সপ্রাপ্তা হতে হবে। এ উদ্দেশ্যে কূট-কৌশলের আশ্রয় নেয়ার মাধ্যমে জোর করে ইচ্ছের বিরুদ্ধে 'শহীদা'কে তৃতীয় এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেয়া হয়। দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর এ ঘটনা বাংলাদেশ হাইকোর্টের দৃষ্টিগোচর হলে হাইকোর্ট স্বপ্রণোদিত হয়ে সরকারের উদ্দেশ্যে ফাত্ওয়া কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না-এ মর্মে রুল জারি করে। পরবর্তীতে দু'টি মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র ফাত্ওয়া প্রদানের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। এর ফলশ্রুতিতে জানুয়ারি ২০০১ সালে হাইকোর্ট সকল প্রকার ফাত্ওয়া প্রদান এবং ফাত্ওয়া প্রদানের মাধ্যমে কাউকে শাস্তি প্রদান অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয়।[৭] পরবর্তীতে হাইকোর্টের এ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা হলে মে ২০১১ সালে সুপ্রিমকোর্ট ফাত্ওয়া প্রদান সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় প্রদান করে,[৮] যার সারমর্ম হচ্ছে, ফাত্ওয়া প্রদান বৈধ; কিন্তু শুধুমাত্র যোগ্য ব্যক্তিরাই ফাত্ওয়া দিতে পারবে এবং ফাত্ওয়া প্রদানের মাধ্যমে কাউকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান কিংবা কারো মৌলিক কোন অধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না, যা বাংলাদেশের আইনে সুরক্ষিত।[৯]

সম্প্রতি ফাত্ওয়া সম্পর্কে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট প্রদত্ত উক্ত রায় লিখিত আকারে আপিল বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকের মতামতের ভিত্তিতে যে রায় দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ:

> Fatwa on religious matters only may be given by the properly educated persons which may be accepted only voluntarily but any coercion or undue influence in any form is forbidden.
>
> ধর্মীয় বিষয়াদিতে শুধুমাত্র যথাযথ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ফাত্ওয়া দিতে পারবেন। ফাত্ওয়া শুধুমাত্র স্বেচ্ছায় গ্রহণযোগ্য; তাই কোন ধরনের বল প্রয়োগ কিংবা অবৈধ প্রভাব প্রয়োগ করা এ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ।
>
> But no person can pronounce fatwa which violates or affects the rights or reputation or dignity of any person which is covered by the laws of the land.

৭. রিট পিটিশন নং ৫৮৯৭/২০০০, রায় প্রদানের তারিখ ১ জানুয়ারি, ২০০১

৮. সিভিল আপিল নং ৫৯৩-৫৯৪/২০০১, রায় প্রদানের তারিখ ১২ মে, ২০১১

৯. আশুতোষ সরকার, Fatwa legal, not to be imposed, ১৩ মে, ২০১১ http://archive.thedailystar.net/newDesign/newsdetails.php?nid=185458 1/3, সংগ্রহের তারিখ, ২৮.০২.২০১৫

কোন ব্যক্তির অধিকার বা খ্যাতি বা মর্যাদা বিনষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত করে, যা দেশের আইনে সংরক্ষিত, এমন ফাত্ওয়া প্রদান করা যাবে না।

No punishment, including physical violence and/or mental torture in any form, can be imposed or inflicted on anybody in pursuance of fatwa.

ফাত্ওয়ার মাধ্যমে কাউকে কোন ধরনের শারীরিক বা মানসিক কোন কষ্ট দেয়া যাবে না।

The declaration of the High Court Division that the impugned fatwa is void and unauthorized, is maintained.

সুপ্রিমকোর্ট পূর্বে উল্লেখিত ফাত্ওয়াটি সম্পর্কে হাইকোর্টের বাতিলকৃত ও কর্তৃত্ববহির্ভূত মর্মে দেয়া রায় বহাল রাখেন।[১০]

ফাত্ওয়া নিয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের উপর্যুক্ত রায় বাংলাদেশের জন-জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং ইতিবাচক একটি অর্জন। ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে না জেনে বা বিধানের গুরুত্ব না বুঝে অনভিজ্ঞ ও অজ্ঞ লোকদের প্রদত্ত ফাত্ওয়া বাংলাদেশের সমাজ জীবনে সময়ে সময়ে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, সুপ্রিমকোর্টের উপর্যুক্ত রায় তা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। ১৩৮ পৃষ্ঠার এ রায়ে যে সকল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, তন্মধ্যে নাগরিকদের মান-মর্যাদা ও খ্যাতি রক্ষার বিষয়টি অন্যতম। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের মানবোচিত মান-মর্যাদা ইসলামে সুরক্ষিত। তাই মানুষের মান-মর্যাদা বিনষ্ট করে, অধিকার লঙ্ঘন করে এমন ফাত্ওয়া দেয়া ইসলামেও অনুমোদিত নয়। ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সাধন করা। এসব বিধান হয় মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে অথবা তাদের জন্য ক্ষতিকর এমন বিষয় তাদের থেকে দূর করে। তাই ফাত্ওয়ার মাধ্যমে কল্যাণ বয়ে আনার পরিবর্তে যদি কারো ক্ষতি হয়, তাহলে সেই ফাত্ওয়া অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং তা প্রত্যাখ্যাত হবে। ফাত্ওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সহজ ও সাবলীলভাবে ইসলামের বিধান পালনে মানুষকে সহযোগিতা দেয়ার পাশাপাশি জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾

তোমাদের জন্য কষ্টকর কোন বিষয়কে আল্লাহ দীনের অন্তর্ভুক্ত করেননি।[১১]

১০. বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট, আপিল বিভাগ, সিভিল আপিল নং ৫৯৩-৫৯৪/২০০১, *Judgement on Fatwa* , পৃ. ১৩৭-১৩৮

১১. আল-কুরআন, ২২ : ৭৮

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জনকল্যাণ (*মাসলাহা*) তিন প্রকার।

এক : এমন ধরণের কল্যাণ, যা ইসলামী আইনে স্বীকৃত এবং বৈধ। যেমন: বিবাহের মাধ্যমে অর্জিত কল্যাণ, নেশাজাতীয় পানীয় হারাম করার মাধ্যমে অর্জিত কল্যাণ ইত্যাদি।

দুই : এমন কল্যাণ, ইসলামে যার বৈধতা বা গ্রহণযোগ্যতা নেই। যেমন: সুদ নিষিদ্ধকরণ; যদিও এটা উপার্জনের একটি মাধ্যম। তদুপরি এ জাতীয় কল্যাণ ইসলামী আইনে বৈধ নয়।

তিন : এমন কল্যাণ, যার বৈধতা কিংবা অবৈধতার ব্যাপারে ইসলামী আইনে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই। এ জাতীয় কল্যাণকে ইসলামী আইনে *"মাসালিহ মুরসালাহ"* বা জনকল্যাণ (public interest) বলা হয়। হালাল কিংবা হারাম হিসেবে সুস্পষ্টভাবে পরিচিত গুটিকয়েক বিষয় ব্যতিরেকে মানবজীবনের বাকী সকল বিষয়ই মূলত এ জাতীয় কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হচ্ছে, এ জাতীয় কল্যাণগুলো মূলত হালাল এবং বৈধ, যতক্ষণ পর্যন্ত না এগুলোর মাধ্যমে ইসলামের সুস্পষ্ট কোন বিধানের লঙ্ঘন হয়।[১২]

এটাই হচ্ছে মূলত ইসলামী আইনের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য। ইসলাম গুটিকয়েক বিষয় সুস্পষ্ট হালাল ও হারাম করার মাধ্যমে কতিপয় সর্বজনীন মূলনীতিসহ বাকী পুরো জগৎ মানুষের প্রয়োজনীয়তা, কল্যাণ এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যই ইসলামী আইনকে গতিশীলতা দান করেছে এবং এর মাধ্যমে ইসলামী আইন কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সকল বিষয়ের সমাধান দিতে সক্ষম হবে। এ বিষয়গুলোকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় (العفو) *"আল-আফউ"* তথা বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামী আইনের মৌলিক কোন বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে এগুলো বৈধ হবে।[১৩] আবূ ছা'লাবাহ আল-খুশানী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عنها

১২. আবদুল আলী মুহাম্মদ ইবনে নিযাম উদ্দীন, *ফাওয়াতিহ আর-রাহমূত শরহে মুসাল্লাম আস-সুবূত*, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ২০০২, খ. ২, পৃ. ৪৭৫; মুহাম্মদ তাওফীক রমাদান আল-বুতী, উসূল আল-ফাতওয়া আশ-শার'য়ীয়্যাহ ওয়া খাসায়িসুহা, *মাজাল্লাত জামেয়াত দিমাস্ক লিল উলুম আল-ইকতিসাদিয়্যাহ ওয়াল কানুনিয়্যাহ*, ২০০৯, ভলিউম ২৫, খ. ২, পৃ. ৬৯৮

১৩. আবু ইসহাক আশ-শাতিবী, *আল-মুয়াফাকাত ফি উসূল আশ-শারীয়াহ*, বৈরূত : আল-মাকতাবাহ আল-আসরীয়্যাহ, ২০০০, খ. ১, পৃ. ১০৮; ওয়াহবাহ আয-যুহাইলী, *উসূল ফিক্হ আল-ইসলামী*, দামেস্ক : দারুল ফিক্র, ১৯৮৬, খ. ১, পৃ. ৯০-৯১

নিশ্চয় আল্লাহ কিছু বিষয় আবশ্যিক করেছেন, তোমরা তাতে অবহেলা করো না; কতিপয় সীমারেখা টেনে দিয়েছেন, তোমরা তা লঙ্ঘন করো না; কিছু বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন, তোমরা তা স্পর্শ করো না এবং কিছু বিষয়ের ব্যাপারে ইচ্ছে করে আল্লাহ নীরব থেকেছেন, সুতরাং তোমরা সেগুলোর বিধান অনুসন্ধান করো না।[১৪]

এ জন্যই যে সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন বিধান নেই সেক্ষেত্রে অহেতুক প্রশ্ন করা থেকে ইসলামে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِى الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

মুসলিমদের মধ্যে জঘন্যতম অপরাধী হলো সেই ব্যক্তি, যে এমন কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করলো, যা মুসলিমদের জন্য হারাম ছিল না; কিন্তু তার প্রশ্নের কারণে তা হারাম করা হলো।[১৫]

ফাতওয়া সংক্রান্ত ইসলামী বিধি-বিধান জানানো তথা ফাত্ওয়ার পরিচয়, ফাত্ওয়া দেয়ার যোগ্যতা, নিয়ম-নীতি, শর্তাবলি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণ নিয়েই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ, যা সুপ্রিমকোর্ট প্রদত্ত রায় বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

৩. ফাত্ওয়ার সংজ্ঞা ও পরিচয়

'ফাত্ওয়া' (الفَتْوَى) শব্দটি আরবী। 'আল-ফুতয়া' (الفُتْيا) ও 'আল-ফুতওয়া' (الفُتْوَى) শব্দরূপগুলোও আরবীতে 'ফাতওয়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৬] এর বহুবচন হচ্ছে 'আল-ফাতাওয়া'। শাব্দিকভাবে এর অর্থ হচ্ছে: কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়া বা কোন বিষয়ের সমাধান দেয়া, হউক তা ইসলামের বিধি-বিধান অথবা অন্য কোন বিষয় সংক্রান্ত। মিসরের বাদশাহর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾

হে পারিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক।[১৭]

কারাগারে ইউসুফের আ. সঙ্গীর ঘটনা বর্ণনায় আল্লাহ বলেন:

﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

১৪. আবুল হাসান আলী ইবনে উমর, *সুনান আদ্-দারেকুতনী*, অনুচ্ছেদ : আর-রিদা', দিল্লী : মাতবাআত আল-আনসার, ১৩০৬ হিজরী, খ. ১০, পৃ. ২৩৪, হাদীস নং-৪৪৪৫। হাদীসটি হাসান পর্যায়ের

১৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অনুচ্ছেদ : তাওক্বীরিহি ওয়া তারক্ ইকছার সুয়ালিহি, বৈরূত : দারুল জীল, তা. বি., খ. ৭, পৃ. ৯২, হাদীস নং-৬২৬৫

১৬. ইবনু মানযূর, *লিসানুল 'আরব*, খ. ১৫, পৃ. ১৪৫

১৭. আল-কুরআন, ১২ : ৪৩

সে তথায় পৌঁছে বলল: হে ইউসুফ! হে মহা সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী-তাদেরকে খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক; আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে পথনির্দেশ প্রদান করুন, যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অবগত করাতে পারি।[১৮]

অন্যত্র সাবা সম্প্রদায়ের রাণীর কথা বলতে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾

বিলকীস বলল: হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।[১৯]

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে এমন সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে 'ফাত্ওয়া' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা শরীয়তের অলঙ্ঘনীয় বিধি-বিধান সম্পর্কিত নয়। অপরদিকে কুরআন কারীমের অন্যত্র শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিষয়ে 'ফাত্ওয়া' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾

হে নবী! তারা আপনার নিকট নারীদের ব্যাপারে জানতে চায়, আপনি বলুন: আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে বিধান দিচ্ছেন।[২০]

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾

হে নবী! মানুষ আপনার নিকট ফাত্ওয়া জানতে চায়, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে কালালাহ এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন।[২১]

ইসলামের বিধি-বিধান জানতে চাওয়া অর্থে 'ফাতওয়া' শব্দের ব্যবহার পূর্বক রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ

তোমাদের মধ্যে যারা ফাত্ওয়া প্রদানে সবচেয়ে বেশি দুঃসাহস দেখায়, মূলত তারা জাহান্নামের আগুন গ্রহণে সকলের চাইতে বেশি দুঃসাহসী।[২২]

১৮. আল-কুরআন, ১২ : ৪৬

১৯. আল-কুরআন, ২৭ : ৩২

২০. আল-কুরআন, ৪ : ১২৭

২১. আল-কুরআন, ৪ : ১৭৬

২২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান, *সুনান আদ্-দারেমী*, অনুচ্ছেদ : আল-ফুতয়া ওয়া মা ফিহি মিন আশ-শিদ্দাহ, দিল্লী, ১৩৩৭ হিজরী, খ. ১, পৃ. ১৮০, হাদীস নং-১৫৯; হাদীসটির সনদ যঈফ; *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ...*, হাদীস নং-১৮১৪

মূলত ফাত্ওয়া তিন ধরনের হয়ে থাকে।

প্রথমত : ফাতওয়া তাশরী'য়ী (الفتوى التشريعي) বা আইন প্রণয়নমূলক ফাত্ওয়া। এ ধরনের ফাত্ওয়া শুধুমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত হয়ে থাকে। যেমন: কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾

হে নবী! তারা আপনাকে নারীদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করে থাকে, আপনি তাদের বলে দিন, আল্লাহ তাদের বিষয়ে তোমাদেরকে অবগত করাবে।[২৩]

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

তারা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আপনি বলে দিন, এটি হচ্ছে মানুষের জন্য (একটি স্থায়ী) সময় নির্ঘন্ট এবং হজ্জের সময়সূচিও।[২৪]

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾

তারা আপনাকে পবিত্র মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আপনি বলে দিন এ মাসে লড়াই করা অনেক বড় গুনাহ।[২৫]

ইত্যাকার বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াত, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত ফাত্ওয়া স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক প্রদত্ত ফাত্ওয়ার উদাহরণ হচ্ছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضى الله عنهما – أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ . حُجِّى عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

ইবনে 'আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, জুহাইনাহ গোত্রের জনৈকা মহিলা রাসূলের স. নিকট এসে বলল: আমার মা হজ্জ আদায় করার মানত করেছিলেন, কিন্তু হজ্জ আদায় করার পূর্বেই তিনি মারা যান, আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারব? রাসূলুল্লাহ স. বললেন: হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারবে; তোমার মায়ের উপর যদি কারো কোন ঋণ থাকতো তুমি কি তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করতে না! সুতরাং আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করে দাও, কারণ আল্লাহর হকই সবচাইতে অধিক আদায়যোগ্য।[২৬]

২৩. আল-কুরআন, ৪ : ১২৭

২৪. আল-কুরআন, ২ : ১৮৯

২৫. আল-কুরআন, ২ : ২১৭

২৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : হজ্জ, অনুচ্ছেদ : আল-হাজ্জ ওয়া আন-নুযুর আনিল মাইয়্যিত, কায়রো : মাতবাআত আল-আমিরিয়াহ, ১২৮৬ হিজরী, খ. ৭, পৃ. ১০৩, হাদীস নং ১৮৫২

দ্বিতীয়ত : ফাত্ওয়া ফিক্হী (الفتوى الفقهي) বা ফিক্হী বিধি-বিধান সম্বলিত ফাত্ওয়া, যা ফিক্হ বিশারদগণ প্রদান করে থাকেন। এ ধরনের ফাত্ওয়া বিশেষ কোন ঘটনার আলোকে প্রদান করা হয় না; বরং শরীয়াতের মৌলিক কোন বিষয় আলোচনা করার প্রাক্কালে এর উদাহরণ, ব্যবহার ও প্রয়োগ ইত্যাদি কারণে প্রাসঙ্গিক বিধান হিসেবে এ সকল ফাত্ওয়া বা সমাধান প্রদান করা হয়ে থাকে। এগুলোকে সাধারণত ফিক্হী অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে নামকরণ করা হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত : ফাতওয়া জুয'য়ী (الفتوى الجزئي), যা বিশেষ কোন প্রশ্ন, কোন ঘটনা ইত্যাদিকে সামনে রেখে প্রদান করা হয়ে থাকে।[২৭] মূলত ফাত্ওয়ার তৃতীয় এ প্রকারটি বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, ফাত্ওয়া এবং ক্বাদ্বা (قضاء) তথা আইনী সিদ্ধান্ত দু'টি ভিন্ন বিষয়। কোন প্রশ্ন বা ঘটনার আলোকে যে মতামত প্রদান করা হয়ে থাকে, যেখানে শুধুমাত্র শরীয়াতের বিধান যেমন: ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরুহ, মুবাহ ইত্যাদি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয় তা ফাত্ওয়া হিসেবে পরিচিত। অপরদিকে কোন বিষয়ে বিবদমান দু'পক্ষের কারো আবেদনের প্রেক্ষিতে বাদী ও বিবাদীর মাঝে বিচারক যে মীমাংসা করে দেন তা আইনী সিদ্ধান্ত হিসেবে পরিচিত। ফাত্ওয়ার ক্ষেত্রে তা মেনে নেয়া এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রশ্নকর্তার উপর কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না; কিন্তু বিচারক প্রদত্ত যে কোন সিদ্ধান্ত বিবদমান উভয় পক্ষ মেনে নিতে বাধ্য থাকে।[২৮] ফাত্ওয়া এবং ক্বাদ্বার পাথর্ক্য বর্ণনায় ইমাম ক্বারাফী (৬২৬-৬৮৪ হি.) বলেন:

> ক্বাদ্বা হচ্ছে দুনিয়ার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের বৈধতা কিংবা বাধ্যবাধকতার বিধানের সূচনা করে প্রদত্ত আইনী সিদ্ধান্ত, অপরদিকে ফাত্ওয়া হচ্ছে বিদ্যমান কোন বিধানের সন্ধানদাতা। ক্বাদ্বার ন্যায় ফাত্ওয়া কোন নতুন বিধান বা সিদ্ধান্ত সূচনা করে না; বরং বিদ্যমান কোন সিদ্ধান্তের সন্ধান দেয় মাত্র।

ক্বাদ্বা ও ফাত্ওয়ার পাথর্ক্য সুস্পষ্ট করতে গিয়ে ইমাম ক্বারাফী আরো বলেন:

> আল্লাহর সাথে মুফতী এবং ক্বাদ্বীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ প্রধান বিচারপতির ন্যায় যে দু'জন লোক নিয়োগ দেয়, যেখানে একজন বিচারকার্যে তার প্রতিনিধি এবং আরেকজন তার দোভাষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। যে বিচারকার্যে তার প্রতিনিধি সে স্বাধীনভাবে কোন বিধান দেয়া, বাধ্যবাধকতা আরোপ করা কিংবা রহিত করা ইত্যাদি করতে পারবে। কিন্তু যে তার দোভাষী তাকে অবশ্যই বিচারপতির প্রতিটি কথা কম-বেশী করা ব্যতীত হুবহু প্রকাশ করতে হবে। সুতরাং মুফতী হচ্ছেন আল্লাহর দোভাষী, যিনি আল্লাহ প্রদত্ত বিদ্যমান বিধানের সন্ধানদানকারী মাত্র। অপরদিকে বিচারক আল্লাহর

২৭. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *উসূল আল-ইফতা ওয়া আদাবুহু*, ঢাকা : মাকতাবাত শাইখুল ইসলাম, ২০১২, পৃ. ১২

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

পক্ষ থেকে স্বীয় চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে নতুন বিধানের সূচনা, বাধ্যবাধকতা আরোপ কিংবা রহিতকরণ ইত্যাদি করে থাকেন।[২৯]

নিম্নের সারণির মাধ্যমে ফাত্ওয়া এবং আইনী সিদ্ধান্তের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হবে :

	ফাত্ওয়া	(ক্বাদ্বা) আইনী সিদ্ধান্ত
এক:	সাধারণত ফাত্ওয়া মুফতীসহ সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। মুফতী সাধারণত সকলের জন্য প্রযোজ্য এমনিভাবে ফাত্ওয়া দিয়ে থাকেন। যেমন: কেউ যদি এ রূপ করে এ রূপ হবে, ইত্যাদি।	নির্দিষ্ট কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রদত্ত আইনী সিদ্ধান্ত হচ্ছে ক্বাদ্বা, যা সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য।
দুই:	প্রশ্নকারীর সমস্যা শুনার পর মুফতী নিজেই আইনের উৎসগুলোতে অনুসন্ধান ও গবেষণা করে সমাধান দিয়ে থাকেন।	সাধারণত বাদী-বিবাদীর পেশকৃত যুক্তি-তর্ক, দলীল-প্রমাণাদির আলোকে বিচারক ফায়সালা করে থাকেন।
তিন:	শুধুমাত্র মুখের কথা নয়; বরং লিখা, ইশারা-ইঙ্গিত ইত্যাদির মাধ্যমেও ফাত্ওয়া দেয়া যেতে পারে।	শুধুমাত্র মুখের কথার মাধ্যমে বিচারকার্য হয়ে থাকে।
চার:	ফাত্ওয়া অনেক বেশী সংবেদনশীল; কারণ এটি সর্বজনীন বিধান, যা প্রশ্নকারীসহ অন্যান্য সকলের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে।	ক্বাদ্বার সংবেদনশীলতা স্বল্প; কারণ বাদী-বিবাদী ব্যতিরেকে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সাধারণত ক্বাদ্বা প্রযোজ্য হয় না।
পাঁচ:	ইবাদাত, যাবতীয় লেন-দেন, শিষ্টাচার, চারিত্রিক বিষয়াবলি ইত্যাদি সকল কিছুর ক্ষেত্রে ফাত্ওয়া প্রযোজ্য।	বিচারকার্য সাধারণত *মু'আমালাত* তথা লেন-দেন সংক্রান্ত বিষয়ে হয়ে থাকে।
ছয়:	কোন বিষয়ে শরীয়াতের বিধান বর্ণনাই হচ্ছে ফাত্ওয়ার মূল উদ্দেশ্য। তাই ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরুহ কিংবা মুবাহ সকল ক্ষেত্রেই ফাত্ওয়া প্রযোজ্য হতে পারে।	ওয়াজিব, হারাম এবং মুবাহ এ তিনটি ক্ষেত্রে ক্বাদ্বা প্রযোজ্য; মাকরূহ কিংবা মুস্তাহাব বিষয়াবলিতে ক্বাদ্বা প্রযোজ্য নয়। কারণ ক্বাদ্বা বল প্রয়োগ উপযোগী, কিন্তু মাকরূহ কিংবা মুস্তাহাব বল প্রয়োগ উপযোগী নয়।
সাত:	ফাত্ওয়া দেয়ার জন্য এর কোনটিই শর্ত নয়, যতক্ষণ না তাদের লিখা কিংবা ইশারা বোধগম্য হয়।	সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত হচ্ছে, বিচারকের জন্য স্বাধীন, পুরুষ, দৃষ্টি, শ্রবণ ও বাকশক্তির অধিকারী হওয়া শর্ত।

[২৯]. ইমাম আহমাদ ইবনে ইদ্রীস আল-ক্বারাফী, *আল-ইহকাম ফি তামযীয আল-ফাতাওয়া আনিল আহকাম ওয়া তাসাররুফাত আল-ক্বাদ্বী ওয়া আল-ইমাম*, তাহকীক : আবদুল ফাত্তাহ আবু-গুদ্দাহ, হালাব : মাকতাবাত আল-মাতবুআত আল-ইসলামিয়াহ, ১৩৮৭ হিজরী, পৃ. ২০; সুলাইমান আবদুল্লাহ আল-আশক্বার, *আল-ফুতইয়া ওয়া মানাহিজুল ইফতা*, কুয়েত : মাকতাবাত আল-মানার আল-ইসলামিয়াহ, ১৯৭৬, পৃ. ১০-১১

আট:	মুফতীর জন্য এ ধরনের কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।	দৈনন্দিন রুটিন কিংবা একান্ত আত্মীয়-স্বজন ব্যতিরেকে অন্য কারো থেকে উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা বিচারকের জন্য বৈধ হবে না।
নয়:	ফাত্ওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো আবশ্যিক নয়।	বিচারকার্য সমাধা করার জন্য সুনির্দিষ্ট স্থান, নির্দিষ্ট প্রসেস ও প্রটোকল যেমন: পাহারাদার, লিখক ইত্যাদি আবশ্যক।
দশ:	ফাত্ওয়া ইসলামের বিধান বর্ণনাকারী; কিন্তু তা মেনে নিতে বল প্রয়োগ উপযোগী নয়।	ক্বাদ্বা বল প্রয়োগ উপযোগী, অর্থাৎ: বাদী-বিবাদী উভয়ই সংশ্লিষ্ট আইনী সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

সারণি ০১: ফাত্ওয়া এবং (*ক্বাদ্বা*) আইনী সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য [৩০]

৪. ফাত্ওয়া প্রদানের গুরুত্ব এবং এ ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন

ফাত্ওয়া প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ, সম্মানজনক কিন্তু সংবেদনশীল দায়িত্ব। ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন:

> اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء، وقائم بفرض الكفاية، ولكنه في معرض للخطر، ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله سبحانه وتعالى
>
> ফাত্ওয়া প্রদান অত্যধিক মর্যাদাপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ, বিপজ্জনক একটি দায়িত্ব। মুফতীগণ হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী। তারা সকলের পক্ষ থেকে ফাত্ওয়া প্রদানের গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকেন, যা সামগ্রিকভাবে (ফরযে কিফায়া) পুরো জাতির উপর আবশ্যিক। কিন্তু এটি বিপজ্জনকও বটে। তাই বলা হয়ে থাকে: মুফতীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করে থাকেন।[৩১]

ইমাম শাতিবী (৫৩৮-৫৯০ হি.) বলেন:

> শরীয়াতের বিধান প্রচার-প্রসার, মানুষকে শরীয়াত শিক্ষা প্রদান, চিন্তা-গবেষণা ও ইজতিহাদের মাধ্যমে নতুন বিষয়ে শরীয়াতের বিধান উদ্ভাবন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুফতীগণ নবী-রাসূলদের স্থলাভিষিক্ত। তাই তাঁদের অনুসরণ এবং তাঁদের প্রদত্ত বিধানকে কার্যে পরিণত করা আবশ্যক।[৩২]

মুফতীগণকে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারী হিসেবে বিবেচিত করে ইমাম ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.) তাঁর একটি গ্রন্থের নামকরণ করেছেন *"ই'লাম আল-*

[৩০]. লেখকের নিজস্ব চিত্রায়ণ। বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন : মুহসিন সালিহ আদ-দাসূকী, *দাওয়াবিত আল-ফাতওয়া ফি আশ্-শারীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাত নাজাজ মুসতাফা আল-বায, ২০০৭, পৃ. ২৭-৩৫

[৩১]. ইমাম মুহীউদ্দিন আন্-নববী, *আল-মাজমু' শরহে আল-মুহায্যাব*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০১০, খ. ১, পৃ. ১৬৬

[৩২]. আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৮

মুওয়াক্কি'য়ীন 'আন রাব্বিল আলামীন" অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারীদের পথ নির্দেশিকা। সাধারণত যারা রাজা-বাদশাহদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন, মানুষের নিকট তাদের মান-মর্যাদা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন, তাদের মান-মর্যাদা কিরূপ হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।[৩৩] ফাত্ওয়া প্রদানের এ গুরুত্ব ও মর্যাদার ব্যাপারে মুফতীদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। এটা কোন নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে, আবেগের পরিপূর্ণ ব্যবহার করে ব্যক্তিগত মতামত প্রদানের স্থান নয়; বরং এটা জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাহদের জন্য যে বিধান দিয়েছেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে জানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব, যা মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। তাই ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুফতীদের সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। তাই তো যুগ পরিক্রমায় দেখা যায়, অনেক বড় বড় স্কলারও ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতেন এবং যথাসম্ভব ফাত্ওয়া প্রদান থেকে নিজেকে বিরত রাখতেন। ইবনু আবদিল বার্ উকবা ইবনু মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন: আমি ইবনু উমরের সাথে ৩৪ মাস ছিলাম, অধিকাংশ সময়ে যখনি তাঁকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করা হত তিনি বলতেন: আমি জানি না। এরপর তিনি আমার দিকে ফিরে বলতেন:

تدري ما يريد هؤلاء ؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً لهم إلى جهنم

তুমি কি জান, এরা কী চায়? এরা আমাদের পিঠকে সেতু বানিয়ে জাহান্নাম পাড়ি দিতে চায়।[৩৪]

আল-খাতীব আল-বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি.) বলেন: ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামও অত্যধিক সাবধানতা অবলম্বন করতেন এবং কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ অবগত ও নিশ্চিত না হয়ে তাঁরা কোন ফাত্ওয়া দিতেন না। তারা সর্বদা চাইতেন তাঁদের পক্ষ থেকে অন্য কেউ যেন ফাত্ওয়া দিয়ে দেয়।[৩৫] বারা ইবনু আযিব রা. বলেন: "আমি তিনশত বদরী সাহাবীকে দেখেছি যাদের সবাই চাইতেন তাদের অপরজন যেন ফাত্ওয়া প্রদানের কাজটি সমাধা করে দেয়।"[৩৬] ইমাম শাফিয়ী (১৫০-২০৪ হি.) বলেন: "আমি যাদেরকে দেখেছি তাদের মধ্যে ইবনু উয়াইনাহ অন্যতম, যাঁকে আল্লাহ ফাত্ওয়া প্রদানের সর্বোচ্চ যোগ্যতা দিয়েছেন; তথাপিও তিনি

৩৩. ইউসুফ আল-কারজাভী, *আল-ফাতওয়া বাইনা আল-ইনদিবাত ওয়াত তাসাইউব*, বৈরূত : আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৯৯৫, পৃ. ১৬

৩৪. ইবনু 'আবদিল বার্, *জামি'উ বায়ানিল 'ইলম ওয়া ফাদলিহি*, রিয়াদ : দারু ইবনি হাযম, ২০০৩, খ. ২, পৃ. ১১৯

৩৫. আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, রিয়াদ : দার ইবনুল জাওযী, ১৯৯৬, খ. ২, পৃ. ৩৪৯

৩৬. প্রাগুক্ত

ফাত্ওয়া প্রদান থেকে নিজেকে যথাসম্ভব বিরত রাখতেন।"[৩৭] সুফ্ইয়ান ইবনে উয়াইনাহ (১০৭-১৯৮ হি.) বলেন: "মূলত জ্ঞানী সেই ব্যক্তি যে ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করে, আর মূর্খ সে যে ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে বেশী বাকপটু হয়।"[৩৮] ইমাম শা'বীকে (১৬-১০৪/১০৬ হি.) কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন: 'আমি জানি না'। তখন তাকে বলা হলো 'আমি জানি না' এ কথা বলতে তোমার লজ্জা হলো না অথচ তুমি হলে ইরাকের প্রসিদ্ধ ফকীহ? তিনি বললেন: কিন্তু ফেরেশতাগণও এ কথা বলতে লজ্জা করেনি যখন তারা বলেছিল: "হে আল্লাহ আপনি যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যতিরেকে আমরা আর কিছুই জানি না"।[৩৯] আবু না'ঈম বলেন: "আমি ইমাম মালিকের রহ. (৯৩-১৭৯ হি.) মত কাউকে দেখিনি, যে কোন প্রশ্নের উত্তরে এত বেশী পরিমাণে 'আমি জানি না' বলে থাকে।"[৪০] আবু যাইয়াল বলেন: "তুমি যদি বলো আমি জানি না তাহলে তারা তোমাকে শিখিয়ে দেবে যাতে তুমি জানতে পার, আর যদি বলো আমি জানি তাহলে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, যদিও তুমি না জেনে থাক।"[৪১] ইমাম শাফিয়ীকে রহ. একদা কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি চুপ থাকলেন। তখন তাকে বলা হলো তুমি উত্তর দিচ্ছো না কেন? তিনি বললেন:

حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب

যতক্ষণ না আমি জানতে পারব, চুপ থাকা কিংবা উত্তর দেয়ার মধ্যে কোনটা উত্তম হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি চুপ থাকব।[৪২]

এছাড়াও কোন বিষয়ে না জেনে ফাত্ওয়া প্রদান করাকে স্কলারগণ মারাত্মক অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে রাসূলের স. একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا ، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا ، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানকে মানুষের অন্তর থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিবেন না; বরং জ্ঞানীদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে তিনি জ্ঞানকে উঠিয়ে নেবেন। সুতরাং যখন

৩৭. প্রাগুক্ত

৩৮. প্রাগুক্ত

৩৯. ইমাম আহমাদ ইবনে হামদান আল-হাররানী, *সিফাত আল-ফাতওয়া ওয়াল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী*, বৈরূত : আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৩৯৭ হিজরী, পৃ. ৯। এখানে কুরআন কারীমের সূরা আল-বাক্বারাহ'র ৩২ নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

৪০. ইমাম আহমাদ ইবনে হামদান আল-হাররানী, প্রাগুক্ত

৪১. প্রাগুক্ত

৪২. ইমাম আন-নববী, *আদাবুল ফাতওয়া*, দিমাশক : দারুল ফিকর, ১৪০৮ হি. পৃ. ১৫

কোন জ্ঞানী ব্যক্তি আর অবশিষ্ট থাকবে না, তখন মানুষ মূর্খদেরকে তাদের নেতা বানিয়ে নিবে, মানুষ তাদের থেকে বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইবে, এবং তারা না জেনে এ সকল বিষয়ে ফাত্ওয়া দিবে। পরিণামে তারাও পথভ্রষ্ট হবে এবং মানুষদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[৪৩]

এছাড়াও আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَت فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

যাকে কোনো ভুল ফাতওয়া দেওয়া হলো, তার পরিণাম ফাত্ওয়া দানকারীকেই ভোগ করতে হবে।[৪৪]

মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ইমাম আবু হানীফার রহ. (৮০-১৫০ হি.) মতামত হচ্ছে, অবুঝ ব্যক্তির লেনদেনের উপর আইনী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না। কিন্তু যে মুফতী না জেনে ফাত্ওয়া দিয়ে থাকে তার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার মতামত হচ্ছে, তার কার্যক্রম ও লেনদেনের উপর আইনী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে; কারণ সে আল্লাহর বিধান নিয়ে খেল-তামাশা করে, যার পরিণাম পুরো জাতিকেই ভোগ করতে হয়। তাই তার ব্যক্তিগত কার্যক্রমের স্বাধীনতা সামগ্রিক ক্ষতির সমকক্ষ হতে পারে না।[৪৫]

৫. মুফতী হওয়ার শর্তাবলি

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের বিধান প্রচার-প্রসারে মুফতীগণ হচ্ছেন নবী-রাসূলের স্থলাভিষিক্ত এবং তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারীতুল্য। মর্যাদাবান এ রকম একটি দায়িত্ব পালনের জন্য অবশ্যই তাদেরকে সার্বিকভাবে যোগ্য হতে হবে। ফাত্ওয়া প্রদানের জন্য ইসলামের বিধি-বিধানের পর্যাপ্ত জ্ঞান, কুরআন ও হাদীসের গভীর জ্ঞান, ইসলামী আইনের দলিল-প্রমাণাদি অবগতি, আরবী ভাষায় দক্ষতা, ইসলামী আইনে চিন্তা-গবেষণা করার যোগ্যতা, নতুন সংঘটিত বিষয়ে সমাধান প্রদানে সক্ষমতা, সর্বোপরি জন-জীবন সর্ম্পকে বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ নানাবিধ বিষয়ে যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। ইমাম নববী বলেন:

شرط المفتي كونه مكلفا مسلما، وثقة مأمونا، متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظا، سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته

৪৩. ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ইলম, অনুচ্ছেদ : কাইফা ইউকবাদ আল-ইলম, বৈরূত : দার ইবনে কাছীর, ১৯৮৭, খ. ১, পৃ. ৫০, হাদীস নং ১০০

৪৪. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আবু আবদুল্লাহ আল-কাযওয়ীনী, *সূনান ইবনে মাযাহ*, অনুচ্ছেদ : ইজতিনাব আর-রায়ি' ওয়াল ক্বিয়াস, দিল্লী, ১৯০৫, খ. ১, পৃ. ৬৪, হাদীস নং ৫৫; শাইখ আলবানী হাদীসটি হাসান বলে মূল্যায়ন করেছেন

৪৫. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

মুফতী হওয়ার শর্ত হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্ক, মুসলিম, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, পাপাচার ও চারিত্রিক মাধুর্য নষ্ট করে এমন বিষয় থেকে মুক্ত, বুদ্ধিমান, সুস্থ মন-মানসিকতার অধিকারী, সঠিক চিন্তাশক্তি সম্পন্ন, লেনদেনে বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার, গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী এবং সচেতন হওয়া। এ ক্ষেত্রে পুরুষ, নারী, দাস, স্বাধীন, অন্ধ কিংবা বোবা সবাই সমান, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের লিখা কিংবা ইশারা-ইঙ্গিত বোধগম্য হয়।[৪৬]

ইবনে হাজার আল-হাইতামীর (৯০৯-৯৭৩ হি.) উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনু আবিদীন (১১৯৮-১২৫২হি.) বলেন:

لا يجوز الإفتاء لمن لم يتعلم الفقه لدى أساتذة مهرة، وإنما طالع الكتب الفقهية بنفسه، وإن الكتب الفقهية لها أسلوب يخصها، فربما يذكر الفقهاء كلاما مطلقا ويقصدون شيئا مقيدا، اعتمادا على ذكر تلك القيود في مواضع أخرى، أو على فهم السامع

যে ব্যক্তি দক্ষ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিকট শিক্ষা লাভ করেনি; বরং ফিক্হী বই-পুস্তক নিজে নিজে অধ্যয়ন করেছে, ফাত্ওয়া প্রদান করা তার জন্য বৈধ হবে না। ফিক্হী গ্রন্থগুলোর প্রণয়ন এবং অধ্যয়নের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায়, কোন স্থানে লেখক একটি সাধারণ শব্দ উল্লেখ করে এর মাধ্যমে বিশেষ কোন শর্ত বা অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা তিনি তার গ্রন্থের অপর এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু এটা পাঠক কিংবা শ্রোতার বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে।

সুতরাং নিজে নিজে অধ্যয়নের মাধ্যমে এ বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে নাও বুঝা যেতে পারে, কিন্তু কোন অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকের নিকট অধ্যয়নকালে তিনি অবশ্যই এ ধরনের বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেবেন, যার ফলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।[৪৭] এ ক্ষেত্রে অপর একটি শর্ত হচ্ছে:

لا يجوز الإفتاء لكل من تعلم الفقه لدى الأساتذة، حتى تحصل له ملكة يعرف بها أصول الأحكام، وقواعدها، وعللها، ويميز الكتب المعتبرة عن غيرها

এমনিভাবে যে ব্যক্তি শুধুমাত্র শিক্ষকদের নিকট ফিক্হী বই-পুস্তক অধ্যয়ন করেছে, কিন্তু ফিক্হের মূলনীতি, গবেষণা বা বিধান উদ্ভাবন করার নিয়ম-নীতি, বিদ্যমান বিধি-বিধানের অভ্যন্তরীণ কারণ ও হিকমত ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেনি এবং ফিক্হী গ্রন্থগুলোর গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরতা মূল্যায়ন করার যোগ্যতা অর্জন করেনি, সেও ফাত্ওয়া প্রদানের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না।[৪৮]

৪৬. ইমাম আন্-নববী, *আল-মাজমু'*, খ. ১, পৃ. ১৬৮

৪৭. ইবনে আবেদিন, রাসমুল মুফতী, *মাজমুআত রাসায়েল ইবনে আবেদিন*, আলম আল-কুতুব, তা.বি., খ. ১, পৃ. ১৬; মুহাম্মদ তাক্বী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

৪৮. মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন আর-রাশেদী, *আল-মিসবাহ ফি রাসমিল মুফতী ওয়া মানাহিজ আল-ইফতা*, বৈরূত : দারু ইহয়া আত-তুরাছ আল-আরবী, ২০০৫, পৃ. ২৮৬

নিম্নে মুফতী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি আলোচনা করা হল:

মৌলিক শর্তাবলি[৪৯]

এক: কুরআন-কারীমের জ্ঞান: কুরআন কারীম হচ্ছে ইসলামের সকল বিধি-বিধানের মূল উৎস। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾

হে নবী! আমি আপনার প্রতি এমন গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যা হচ্ছে প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়ত, রহমত এবং মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ।[৫০]

সুতরাং আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত সকল বিধি-বিধান, এ সকল বিধি-বিধানের উদ্ভাবনী নীতিমালা, এগুলোর অন্তর্নিহিত হিকমাত, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ে মুফতীর সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এছাড়াও কুরআন বুঝার জন্য যে সকল জ্ঞানের প্রয়োজন হয় যেমন: নাসিখ[৫১] ও মানসুখ,[৫২] আয়াত নাযিলের উপলক্ষ ও প্রেক্ষাপট, কুরআনের শব্দাবলির অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্দি করার বিভিন্ন নীতিমালা তথা আম,[৫৩] খাস,[৫৪] মানতুক,[৫৫] মাফহুম,[৫৬] মুজমাল,[৫৭] মুফাচ্ছার,[৫৮] নাস,[৫৯]

৪৯. মুহসিন সালিহ আদ-দূসকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

৫০. আল-কুরআন, ১৬ : ৮৯

৫১. পরবর্তীতে নাযিলকৃত বিধান যা পূর্ববর্তী বিধানকে রহিত করে দেয়। কুতুব মুস্তফা সানু, *মু'জাম মুসতালাহাত উসূল ফিক্হ*, দামেস্ক : দারুল ফিক্র, ২০০০, পৃ. ৪৫৭

৫২. পরবর্তীতে নাযিলকৃত দলীলের মাধ্যমে পুর্ববর্তী যে বিধানটি রহিত করা হয়েছে তা হচ্ছে মানসূখ। কুতুব মুস্তফা সানু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫২

৫৩. সাধারণ অর্থবোধক শব্দ, যা গঠনগত দিক থেকে তদসংশ্লিষ্ট সকল কিছুকে অন্তর্ভূক্ত করে থাকে, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

৫৪. বিশেষ অর্থবোধক শব্দ, যা গঠনগত দিক থেকে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, যেমন : খালিদ, আলী, বা নির্দিষ্ট কোন জাতি, যেমন : মানুষ, সিংহ, বা সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি, যেমন : 'আদ সম্প্রদায়, ছামূদ জাতি, ইত্যাদি বুঝায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

৫৫. কোন শব্দ থেকে পাওয়া সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ অর্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫২

৫৬. শব্দের অস্পষ্ট ও পরোক্ষ অর্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫

৫৭. যে শব্দের অর্থ এবং প্রয়োগ অস্পষ্ট, এবং যা বুঝার জন্য দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

৫৮. যে শব্দের অর্থ এবং প্রয়োগ সুস্পষ্ট, এবং যেখানে দ্বিতীয় কোন ব্যাখ্যা করা (তাওয়ীল), কিংবা কোন কিছুর সাথে শব্দকে নির্দিষ্ট করার (তাখসীস) কোন অবকাশ নেই। রাসূলের স. তিরোধানের পর সকল মুফাচ্ছার শব্দগুলো মুহকাম হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ এগুলো এখন আর রহিত হওয়ার কোন সম্ভবনা নেই, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫

৫৯. কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যদি কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়, এবং উক্ত শব্দ যদি সুস্পষ্টভাবে সে বিশেষ অর্থের প্রতি দিকনির্দেশ করে তাহলে তা হচ্ছে নাস। তবে উক্ত অর্থ তাওয়ীল এবং তাখসীস এর সম্ভাবনা রাখে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯

যাহির,[৬০] সরীহ,[৬১] কিনায়া,[৬২] অলংকারশাস্ত্র তথা মা'য়ানী ও বায়ান ইত্যাদি; ফাত্ওয়া প্রদানের জন্য এ সকল বিষয়ের জ্ঞানও অতীব জরুরী।

দুই: হাদীসের জ্ঞান : কুরআন কারীমের পর ইসলামী আইনের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস হচ্ছে রাসূলের স. হাদীস। হাদীস হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা এবং বাস্তবরূপ। কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে হাদীসের কোন বিকল্প নেই। তাই একজন মুফতীর অবশ্যই হাদীসের জ্ঞান থাকতে হবে। যেহেতু হাদীস কুলহীন সাগরের ন্যায়, তাই সকল হাদীস না হলেও কমপক্ষে ইসলামের বিধি-বিধান সম্বলিত হাদীসগুলো অবগত হতে হবে। উপরন্তু হাদীস সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় যেমন: হাদীসের সূত্র ও বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, হাদীস বর্ণনার প্রেক্ষাপট, হাদীসের সীমাকাল তথা নাসিখ-মানসূখ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একজন মুফতীর দক্ষতা থাকা আবশ্যক।

তিন: ইজতিহাদ ও ক্বিয়াসের জ্ঞান : কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে মানব জীবনের সংঘটিতব্য সকল বিষয়ের মৌলিক সমাধান দেয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির উপর ওহী অবতীর্ণ করার ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দিয়েছেন। যেহেতু এখন ওহী আসার কোন সুযোগ নেই তাই বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান দেয়ার প্রাক্কালে সরাসরি কুরআন-হাদীসে কোন সমাধান না পেয়ে একজন মুফতী হয়তো বিদ্যমান মূলনীতির আলোকে চিন্তা-গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বাধ্য হবেন। তাই ফাত্ওয়া প্রদানকারীকে অবশ্যই চিন্তা-গবেষণা, কিয়াস তথা বিদ্যমান বিধানের আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সমাধান আবিস্কার ও ইজতিহাদ ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। সে ক্ষেত্রে মুফতীকে অবশ্যই মূল বিধান এবং এর উৎস, কিয়াস করার নিয়ম-নীতি, বিদ্যমান বিধানের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য অনুসন্ধানে পূর্ববর্তী স্কলারগণের অনুসৃত পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়েও অবগত হতে হবে।

চার: সর্বজন স্বীকৃত এবং বিতর্কিত বিষয়াবলির জ্ঞান : যে সকল বিষয়াবলিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে পূর্ববর্তী স্কলারগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সে সকল বিষয়াবলি বিবেচনায় রাখা আবশ্যক; কারণ অনেক ক্ষেত্রে সে সকল বিষয়ে নতুন কোন চিন্তা-গবেষণার অবকাশ থাকে না, এবং এ সকল বিষয়ে সর্বজন স্বীকৃত মতামতটিই প্রাধান্য পাবে। অপরদিকে কতিপয় বিষয় যেগুলো বিতর্কিত

৬০. কোন শব্দ শুনার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মস্তিষ্ক যে অর্থের দিকে ধাবিত হয় উক্ত শব্দটি সে অর্থের ক্ষেত্রে যাহির। তবে এ ক্ষেত্রে সমার্থবোধক কিংবা বিপরীত অন্য অর্থও বুঝানোর সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত শব্দকে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না, এবং উক্ত অর্থ তাওয়ীল এবং তাখসীস এর সম্ভাবনা রাখে, প্রাগুক্ত, ২৭২

৬১. যে শব্দের অর্থ পুরোপুরি সুস্পষ্ট, প্রাগুক্ত, ২৫৬

৬২. যে শব্দের অর্থ অস্পষ্ট এবং যা বুঝার জন্য অপর একটি দলীল, কিংবা আকার-ইঙ্গিতের প্রয়োজন হয়, প্রাগুক্ত, ৩৭০

বিষয় হিসেবে বিবেচিত এবং যেখানে একাধিক মতামত প্রদানের সুযোগ রয়েছে, মুফতীকে অবশ্যই এগুলো সম্পর্কে অবগত হতে হবে এবং ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে স্থান কাল পাত্র ভেদে যে মত সর্বাধিক উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে সে অনুযায়ী ফাত্ওয়া প্রদান করবে।

পাঁচ: আরবী ভাষার জ্ঞান : কুরআন, হাদীস থেকে শুরু করে ইসলামী বিধি-বিধানের মৌলিক সকল উৎস আরবী ভাষায় প্রণীত। তাই সঠিক ফাত্ওয়া প্রদানের নিমিত্তে একজন মুফতীর আরবী ভাষার উপর দখল থাকা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে আরবী ভাষার পণ্ডিত না হলেও, কমপক্ষে আরবী ভাষার স্টাইল, সম্বোধন, অর্থ উদ্ভাবন, ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

ছয়: সমাজ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান : যিনি ফাত্ওয়া দিবেন তাকে অবশ্যই তার চতুর্দিকে বসবাসরত সমাজের মানুষের কৃষ্টি-কালচার, রীতি-নীতি, মন-মস্তিষ্ক, চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হতে হবে। মুফতী যদি এক জগতে থাকেন, আর সমাজের মানুষ অপর এক জগতে থাকে তাহলে তার ফাত্ওয়া যথার্থ হওয়ার সম্ভাবনা কম; কারণ সে ক্ষেত্রে যা বাস্তবে হচ্ছে তা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র যা হওয়া উচিত তার মধ্যেই মুফতীর চিন্তা-ভাবনা সীমাবদ্ধ থাকবে, অথচ যা হওয়া উচিত এবং যা বাস্তবে হচ্ছে দু'টো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেন: ফকীহ হচ্ছেন তিনি, যিনি যা হওয়া উচিত এবং যা বাস্তবে হচ্ছে দু'টোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারেন।[৬৩]

সাধারণ শর্তাবলি[৬৪]

এক: মুসলমান হওয়া: যেহেতু ফাত্ওয়া হচ্ছে কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের স. পক্ষ থেকে সমাধান বা মতামত প্রদান করা, তাই এ ক্ষেত্রে সবাই একমত যে, ফাত্ওয়া প্রদানকারীকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে।

দুই: প্রাপ্ত বয়স্ক ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া: অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় ফাত্ওয়া প্রদানকারী প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। যে কোন কাজের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে এ দু'টি সাধারণ শর্ত হিসেবে বিবেচিত।

তিন: পুরুষ বা স্বাধীন হওয়া শর্ত নয়: উল্লেখ্য যে, ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে পুরুষ বা স্বাধীন হওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাই পুরুষ হোক বা নারী, স্বাধীন হোক বা দাস, যে কেউ উপরে বর্ণিত যোগ্যতা সাপেক্ষে ফাত্ওয়া প্রদানের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। ইবনুস সালাহ বলেন: মুফতী হওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং পুরুষ হওয়া শর্ত নয়।[৬৫]

৬৩. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৬৪. মুহসিন সালিহ আদ-দাসূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩; মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯
৬৫. ইবন আস্-সালাহ, *আদাবুল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী*, মদীনা মুনাওয়ারাহ : মাকতাবাত আল-উলুম ওয়াল হিকাম, ২০০২, পৃ. ৫৬

চারিত্রিক শর্তাবলি: [৬৬]

এক: মুত্তাকী ও ন্যায়বিচারক হওয়া: মুফতীর মধ্যে অবশ্যই তাকওয়া ও সুবিচার করার গুণাগুণ থাকতে হবে। শুধুমাত্র শরীয়াতের জ্ঞান থাকাই বড় কথা নয়; বরং সে জ্ঞান অনুযায়ী সর্বাগ্রে নিজেকে কাজ করতে হবে। সাথে সাথে আল্লাহভীতি, একনিষ্ঠতা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ইত্যাদি গুণাবলি আয়ত্ত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾

নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে আলিমরাই আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করে।[৬৭]

আলী (২৩ হি.পূর্ব-৪০ হি.) রা. বলেন:

ফকীহ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না, কোন অপরাধমূলক কাজে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা অনুসন্ধান করে না। যে জ্ঞানের মধ্যে ফিক্হের জ্ঞান নেই সেখানে সত্যিকার কোন কল্যাণ নেই, আবার যে ফিক্হতে তাকওয়া, গবেষণা, অনুসন্ধান নেই সেখানে সত্যিকার কল্যাণ নেই।[৬৮]

হাসান বসরী (২১-১১০ হি.) র. বলেন:

সত্যিকারের ফকীহ হচ্ছে সে যে মুত্তাকী, আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং দুনিয়ার সম্পদ থেকে লোভমুক্ত। যে তার থেকে নিম্নপর্যায়ের কোন ব্যক্তিকে উপহাস করে না, উচ্চ পর্যায়ের কোন ব্যক্তির প্রতি লালায়িত হয় না এবং সর্বোপরি পার্থিব কোন সম্পদ অর্জনের জন্য জ্ঞান অর্জন করে না।[৬৯]

দুই: ভুল থেকে প্রত্যাবর্তন করা: একজন ফকীহর চারিত্রিক মাধুর্যের আরেকটি অন্যতম দিক হচ্ছে, যখনি সে কোন বিষয়ে ভুলের ব্যাপারে নিশ্চিত হবে সাথে সাথে তা থেকে ফিরে এসে বিশুদ্ধ মতটি গ্রহণ করবে এবং ভুলের উপর বহাল থাকবে না। অনিচ্ছাকৃত এ ভুলের জন্য তার কোন গুনাহ হবে না; বরং চিন্তা-গবেষণা করার জন্য সে একটি প্রতিদান পাবে। আর যদি তা বিশুদ্ধ হয় তাহলে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

বিচারক যদি স্বীয় চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার মাধ্যমে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয় এবং তা সঠিক হয় তাহলে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে, আর যদি ভুল হয় একটি প্রতিদান পাবে।[৭০]

৬৬. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৬৭. আল-কুরআন, ৩৫ : ২৮
৬৮. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৬৯. প্রাগুক্ত
৭০. ইমাম আত্-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অনুচ্ছেদ : মা জা'আ ফিল ক্বাদী ইউসিবু ওয়া ইউখতিয়ু, বৈরূত : দারুল জীল, ১৯৯৮, খ. ৫, পৃ. ২৯৯, হাদীস নং ১৩৭৬; হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও ভিন্নশব্দে রয়েছে।

তিন: যা সঠিক তা অনুযায়ী ফাত্ওয়া দেয়া: নিজের জ্ঞানানুযায়ী চিন্তা-গবেষণা করার পরে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে, যা সঠিক বলে মনে হবে, ফকীহকে অবশ্যই সে অনুযায়ী ফাত্ওয়া দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে অবৈধ কোন চাপ কিংবা হস্তক্ষেপের কারণে নিজের মতামত পরিবর্তন করা ফকীহর জন্য বৈধ হবে না। ইতিহাস পরিক্রমায় আমরা দেখি, ইমাম আবু হানীফা, ইবনু তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হি.), আহমাদ ইবনু হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) প্রমুখ স্কলারগণ অনেক জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছেন, কিন্তু তবুও তারা তাদের দেয়া ফাত্ওয়া পরিবর্তন করেননি।

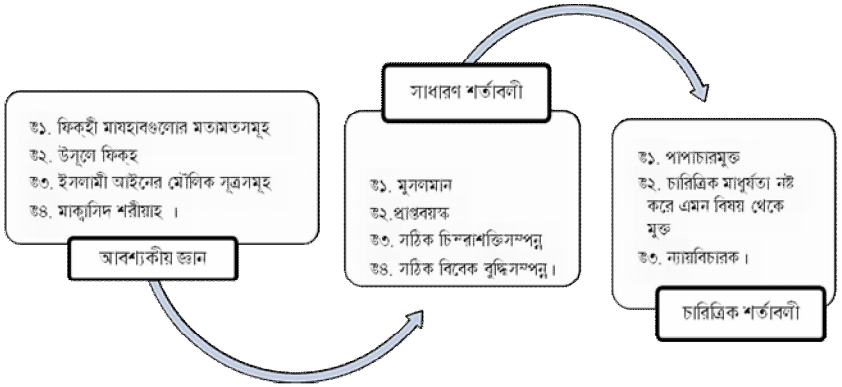

চিত্র ০১: মুফতী হওয়ার শর্তাবলী[৭১]

আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফিক্হ একাডেমী ওআইসি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তে নং ১৫৩ (২/১৭) মুফতী হওয়ার জন্য যে সকল শর্তাবলি নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

ক. কুরআন, সুন্নাহ এবং তদ্বসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির জ্ঞান থাকা;

খ. স্কলারদের সর্বসম্মত ও বিতর্কিত মতামতগুলো জানা এবং ইসলামী আইনের বিভিন্ন মাযহাব ও ফিক্হী মতামতগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা;

গ. উসূলে ফিক্হ, কাওয়ায়িদ ফিক্হ এবং মাক্বাসিদ শরীয়াহ তথা ইসলামী আইনের গবেষণার মূলনীতি, ইসলামী আইনের মৌলিক সূত্রসমূহ, ইসলামী আইনের মহৎ উদ্দেশ্যাবলি ইত্যাদি বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ দখল থাকা। সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন: আরবী ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক;

৭১. লেখকের নিজস্ব চিত্রায়ণ। শর্তবালী বিস্তারিত জানতে আরো দেখুন : আবদুল আজীজ ইবনে রাবী'আ, *আল-মুফতী ফী আশ্-শরীয়াহ আল-ইসলামিয়াহ ওয়া তাতবীকাতুহু ফি হাযা আল-'আসর*, রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮, পৃ. ২০-২৮; সুলাইমান আবদুল্লাহ আল-আশক্বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

ঘ. সমাজের মানুষের অবস্থা, কৃষ্টি-কালচার, সময়ের আবর্তনে ঘটিত নতুন ঘটনাবলি, চতুর্দিকে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন, উত্থান-পতন, ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত থাকা;

ঙ. ইসলামী আইনের মৌলিক উৎসসমূহ থেকে গবেষণার মাধ্যমে নতুন বিষয়ের জন্য আইন ও সমাধান বের করার যোগ্যতা থাকা;

চ. সর্বোপরি কোন বিষয়ে ফাত্ওয়া দেয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং কুশলীদের মতামত সংগ্রহ করা, যেমন: ডাক্তারী বিষয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং অর্থনীতির বিষয়ে অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদের সাথে পরামর্শ করে তাদের মতামত সংগ্রহ করা আবশ্যক।[৭২]

৬. ফাত্ওয়া প্রদানের নীতিমালা [৭৩]

উপরে আলোচনা করা হয়েছে, ফাত্ওয়া মুসলিম সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সংবেদনশীল একটি বিষয়। সঠিক নিয়মে প্রদত্ত ফাত্ওয়া যেমনিভাবে মানব সমাজের কল্যাণ বয়ে আনে, তেমনিভাবে সঠিক নিয়ম-নীতি বহির্ভূত ফাত্ওয়া মানব সমাজের অকল্যাণ ও ক্ষতি বয়ে আনতে বাধ্য। তাই ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ নীতিমালা অনুসরণ আবশ্যক। নিম্নে ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় এবং পালনীয় কতিপয় নীতিমালা আলোচনা করা হয়েছে:

এক: ফাত্ওয়া প্রদানকারী উপযুক্ত এবং নির্ভরযোগ্য মুফতী হতে হবে। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি ফাত্ওয়া দেয়, তাহলে সে গুণাহগার হবে।[৭৪] কুরআন-কারীমে আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র জ্ঞানীদের থেকে কোন বিষয়ে জানতে চাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন:

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾

অতএব তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।[৭৫]

অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ﴾

৭২. ইসলামী ফিক্হ একাডেমী ওআইসি, ক্বারারাত ও তাওসীয়াত, *মাজাল্লাত আশ-শরীয়াহ ওয়াল কানুন*, ২০০৬, খ. ২৭, পৃ. ৫৪৯

৭৩. মুহসিন সালিহ আদ-দাসূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮৫; ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১৩৫; আবদুল আজীজ ইবনে রাবী'আ, প্রাগুক্ত, ২৯-৫২

৭৪. ইবনুল কাইয়িম, *ইলাম আল-মুওয়াক্কি'য়ীন আন রাব্বিল আলামীন*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৪, খ. ৪. পৃ. ৪৫৮

৭৫. আল-কুরআন, ১৬ : ৪৩

তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে, তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বল না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তারা কখনো সফলকাম হবে না।[৭৬]

আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بنيانه في جهنم و من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه و من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه.

যে ব্যক্তি আমি বলি নাই এমন কথা আমার পক্ষ থেকে বলে সে যেন জাহান্নামে নিজের স্থান নির্ধারণ করে নিল; যে ব্যক্তি না জেনে কোন বিষয়ে ফাত্ওয়া দেয় এর গুনাহ তার উপর বর্তাবে, প্রশ্নকারীর উপর নয়; যে ব্যক্তি সঠিক নয় জেনেও কাউকে সে বিষয়ে ইতিবাচক পরামর্শ দেয়, সে যেন তার খেয়ানত করল।[৭৭]

দুই: শরীয়াতের মৌলিক ও সুস্পষ্ট কোন দলীল-প্রমাণ, কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদীস ইত্যাদির সাথে ফাত্ওয়া সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। এমনটি হলে এ ধরনের ফাত্ওয়া গ্রহণযোগ্য হবে না।

তিন: ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে কোন মাযহাব বা নির্দিষ্ট কোন মতামতের অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না। মুফতী নিজে কোন নির্দিষ্ট মতামত অনুসরণ করলেও ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে যে মতটি প্রশ্নকর্তার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে সে অনুযায়ী ফাত্ওয়া দিতে হবে। এখানে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি মাযহাবই সঠিক এবং এর মধ্যে যে সিদ্ধান্তটি প্রশ্নকারীর জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত বলে মনে হবে, সে মতানুযায়ী ফাত্ওয়া দিতে হবে।[৭৮] ইবনুল কাইয়িম বলেন: মুফতীর উচিত যে মতামতটি সঠিক বলে মনে হবে সে অনুযায়ী ফাত্ওয়া দেয়া, যদিও তা স্বীয় মাযহাবের বিপরীত হয়।[৭৯]

৭৬. আল-কুরআন, ১৬ : ১১৬

৭৭. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হাকিম আন-নীসাবুরী, *আল-মুসতাদ্রাক আলা-আস্-সাহীহাইন*, অধ্যায় : ইলম, অনুচ্ছেদ : মান কালা আলাইয়া মা লাম আকুল, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৩, হাদীস নং ৩৫০

৭৮. আবদুল মাজীদ মুহাম্মদ আস্-সূসূহ, দাওয়াবিতুল ফাতওয়া ফিল ক্বাদায়া আল-মু'আসারাহ, *মাজাল্লাত শরীয়াহ ওয়া দিরাসাত ইসলামিয়াহ*, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫, খ. ৬২, পৃ. ২২৩; শাহ ওয়ালীউল্যাহ দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহি আল-বালিগাহ*, বৈরূত : দারুল জীল, ২০০৫, খ. ১, পৃ. ২৬৪

৭৯. ইবনুল কাইয়িম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪২৮

চিত্র ০২: মাযহাবসমূহ পারস্পরিক সাংঘর্ষিক নয় [৮০]

তবে উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে তালফীক করা যাবে না। তালফীক হচ্ছে কোন একটি বিষয়ের আংশিক কোন কিছুতে সকল মাযহাবের সংমিশ্রণে নিজের সুবিধামত এমন মতামত তৈরী করা, যাতে কোন স্কলার কিংবা কোন মাযহাবের সমর্থন নেই। নিচের সারণির মাধ্যমে তালফীক এর ধারণা আরো সুস্পষ্ট হবে।

বিষয়: মুসলিম বিবাহে অভিভাবক কিংবা সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা			
	হানাফী মাযহাব	মালিকী মাযহাব	শাফিয়ী মাযহাব
অভিভাবক	আবশ্যক নয়	আবশ্যক	আবশ্যক
সাক্ষী	আবশ্যক	আবশ্যক নয়	আবশ্যক

সারণি ০২: তালফীক এর সচিত্র বিশ্লেষণ[৮১]

এখন কেউ যদি অভিভাবকের ক্ষেত্রে হানাফী মতামত এবং সাক্ষীর ক্ষেত্রে মালিকী মতামত গ্রহণপূর্বক ফাত্ওয়া দেয় যে, মুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবক কিংবা সাক্ষী কোনটিই আবশ্যক নয়, এটাই হবে তালফীক এবং এটা বৈধ নয়; কারণ ইতঃপূর্বে কোন স্কলার কিংবা কোন মাযহাব এ ধরনের মতামত ব্যক্ত করে নি।

চার: ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে যে মতটি পালন করা প্রশ্নকর্তার জন্য সহজ ও সাবলীল হবে সে মতটিই গ্রহণ করতে হবে। সাধারণত ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে সহজ মতটিই গ্রহণ করা উত্তম। যদিও মুফতী ইচ্ছে করলে নিজের জন্য কঠিন মতটি বেছে

৮০. লেখকের নিজস্ব চিত্রায়ণ। দেখুন : মুহাম্মদ ইবনে আলাওয়ী, *শরীয়াত আল্লাহি আল-খালিদাহ, দিরাসাহ ফি তারিখ তাশরী' আল-আহকাম ওয়া মাযাহিব আল-ফুক্বাহা আল-আ'লাম*, মদীনা মুনাওয়ারাহ, মাতাবি' আল-রাশীদ, ১৯৯২, পৃ. ৩৪৪; মুসতাফা আহমদ আয্-যারক্বা, *আল-ফিক্হ আল-ইসলামী ফি সাওবিহি আল-জাদীদ, আল-মাদখাল আল-ফিক্হী আল-'আম*, দামেস্ক : দারুল ক্বালাম, ১৯৯৮, খ. ১, পৃ. ২৫৯

৮১. লেখকের নিজস্ব চিত্রায়ণ। দেখুন : সা'আদ আল-আনাযী, আত্-তালফীক ফিল ফাতওয়া, *মাজাল্লাত শরীয়াহ ওয়া দিরাসাত ইসলামিয়াহ*, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯, খ. ৩৮, পৃ. ২৬৯

নিতে পারেন, কিন্তু ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই প্রশ্নকর্তার জন্য যেটা উপযুক্ত এবং সহজ সেটি গ্রহণ করতে হবে। যে কোন বিষয়ে সহজ পথ অবলম্বন করা ইসলামের অন্যতম একটি মূলনীতি, যতক্ষণ না এর মাধ্যমে ইসলামী আইনের কোন সিদ্ধান্তের লঙ্ঘন হয়। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজটিই কামনা করেন, এবং তোমাদের জন্য কোন জটিলতা কামনা করেন না।[৮২]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না।[৮৩]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾

আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান; কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৮৪]

আয়েশা রা. (মৃ. ৫৮ হি.) বলেন:

ما خير رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه

রাসূলকে স. কে যখনি দু'টি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে বলা হত, তিনি সর্বদা সহজটিই বেছে নিতেন, যতক্ষণ না তা পাপাচার হয়, আর যদি তা পাপাচার হয় তাহলে বিষয়টি থেকে তিনি সবার চেয়ে বেশী দূরে থাকতেন।[৮৫]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا

তোমরা সহজ কর, কঠিন করিও না; সুসংবাদ দাও, দুঃসংবাদ দিও না।[৮৬]

অন্যত্র তিনি বলেন: إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

তোমাদেরকে সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে; কঠিন করার জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয়নি।[৮৭]

৮২. আল-কুরআন, ২ : ১৮৫
৮৩. আল-কুরআন, ৫ : ৬
৮৪. আল-কুরআন, ৪ : ২৮
৮৫. ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অনুচ্ছেদ : সিফাত আন্-নাবী স., বৈরুত : দার ইবনে কাছীর, ১৯৮৭, খ. ৩, পৃ. ১৩০৬, হাদীস নং-৩৩৬৭
৮৬. ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অনুচ্ছেদ : মা কানা আন্-নাবী স., প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮, হাদীস নং ৬৯
৮৭. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অনুচ্ছেদ : আল-আরদ ইউসিবুহা আল-বাউল, বৈরূত : দারুল কিতাব আর-আরবী, তা.বি., খ. ১, পৃ. ১৪৫, হাদীস নং ৩৮০

সুতরাং ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে সহজটিই গ্রহণ করা উত্তম। ইমাম সুফ্য়ান আস-সাওরী (৯৭-১৬১ হি.) বলেন: "ফিক্হ হচ্ছে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে সহজ পন্থা জেনে নেয়ার নাম; কাঠিন্য তো সবাই অপছন্দ করবে।"[৮৮] তাই স্কলারগণ বলে থাকেন: যদি কঠিন পন্থা গ্রহণ কর তাহলে তা নিজের ক্ষেত্রে কর, কিন্তু মানুষের জন্য সহজ এবং সাবলীল মতটিই বেছে নাও।

চিত্র ০৩: ফাত্ওয়া সংশ্লিষ্ট মূলনীতিসমূহ [৮৯]

পাঁচ: ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সহজ ও সাবলীল ভাষা ব্যবহার করতে হবে। মানুষের কাছে বোধগম্য, মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে সে ভাষায় তাদেরকে সম্বোধন করতে হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾

আমি সকল নবীকে তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে।[৯০]

শুধুমাত্র শব্দ চয়ন নয়; বরং চিন্তা-ভাবনার পদ্ধতি, যুক্তি উপস্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সহজ ও সাবলীল হতে হবে। ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কারণ, অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, প্রদত্ত বিধানের গুরুত্ব ও হিকমাত ইত্যাদিও উল্লেখ করতে হবে, যাতে প্রদত্ত ফাত্ওয়া মেনে নেয়া এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সহজ হয়।

৮৮. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
৮৯. লেখকের নিজস্ব চিত্রায়ণ। উক্ত মূলনীতিগুলো বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন : *আল-মাউসু'আহ আল-ফিক্হীয়্যাহ*, কুয়েত : ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৫, খ. ৩২, পৃ. ২১ ও ৩৮; তাক্বী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯ ও ২০২; ইবনুল কাইয়িম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫; এবং মুহসিন সালিহ আদ-দূসকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
৯০. আল-কুরআন, ১৪ : ৪

ছয়: যে সকল বিষয়ের আলোচনায় ব্যক্তি, সমাজ বা জাতির ইহকালীন কিংবা পরকালীন কোন কল্যাণ নেই, সযত্নে তা এড়িয়ে যেতে হবে। যদি এ সকল বিষয়ে কোন প্রশ্ন আসে তাহলে ব্যক্তি বা সমাজের জন্য কল্যাণকর হয় এমনভাবে তার উত্তর দিতে হবে।

ইমাম আল-কারাফী বলেন: ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে প্রশ্নকারীর জন্য উপযুক্ত কিংবা প্রয়োজনীয় নয় এমন সকল বিষয়ে এড়িয়ে যেতে হবে। যেমন প্রশ্নকারী যদি কোন সাধারণ ব্যক্তি হয়, আর এ ক্ষেত্রে সে যদি আল্লাহর রুবুবিয়্যাত, রাসূলের ব্যক্তিসত্তা ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয়াদি যেগুলো অভিজ্ঞ এবং বড় স্কলারদের আলোচনার বিষয়, সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাহলে এগুলোর উত্তর না দিয়ে তার জন্য দরকারী ইবাদাত কিংবা লেন-দেন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। তবে এ সকল ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তার যদি কোন সন্দেহ-সংশয় থাকে তাহলে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে।[৯১]

যেমন খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযীযকে (৬১-১০১ হি.) সিফ্ফীন যুদ্ধের লড়াই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: "এ সকল রক্তপাত থেকে আল্লাহ তা'আলা আমার হাতকে হেফাজত করেছেন; তাই এ জাতীয় বিষয়ে আলোচনা করে আমি আমার জিহ্বাকে কলুষিত করতে চাই না।"[৯২]

ইবনুল কাইয়িম বলেন:

> অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণকর হয় এমনভাবে উত্তর দেয়া মুফতীর জন্য শুধু কেবল বৈধ নয়; বরং এটা মুফতীর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয়ও বটে।[৯৩]

সাত: ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে হ্যাঁ-না, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত পথ পরিহার করে যথাসম্ভব বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পথ অবলম্বন করতে হবে। যে বিষয়ে ফাত্ওয়া দেয়া হবে তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপরও আলোকপাত করতে হবে, যাতে প্রশ্নকর্তা কিংবা পাঠক সহজেই বিষয়টি আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বলেন:

> ফাত্ওয়ার সৌন্দর্য হচ্ছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করা এবং প্রয়োজনের নিরিখে দলিল-প্রমাণাদি সহকারে বিপরীতধর্মী মতামতগুলোও আলোচনা করতে হবে, যাতে প্রশ্নকারীর মনে যদি কোন সংশয় থাকে তা দূর হয়ে যায়।[৯৪]

ইবনুল কাইয়িম বলেন: কোন বিষয় যদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবী রাখে সে ক্ষেত্রে সংক্ষেপে এবং সাধারণভাবে ফাত্ওয়া দেয়া মুফতীর জন্য বৈধ হবে না।[৯৫]

৯১. আল-ক্বারাফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২
৯২. আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
৯৩. ইবনুল কাইয়িম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪১৪
৯৪. আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
৯৫. ইবনুল কাইয়িম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩৫

আট: ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে প্রশ্নকারীর সমাজ বা এলাকার কৃষ্টি-কালচার, সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। ইসলামের মৌলিক কোন বিষয়ের লঙ্ঘন না করে যথা সম্ভব প্রশ্নকারীর সামাজিক রীতি-নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফাত্ওয়া দিতে হবে। ইমাম কারাফী বলেন: এই বিষয়টি অবশ্যই লক্ষণীয় এবং এতে কোন দ্বিমত নেই। যদি মুফতী এবং প্রশ্নকর্তার শহর কিংবা এলাকার সামাজিক রীতি-নীতি এক না হয়, তাহলে এর প্রেক্ষিতে প্রদত্ত ফাত্ওয়া এক ও অভিন্ন হবে না।[৯৬]

নয়: ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, স্থান, কাল এবং পাত্র ভেদে ফাত্ওয়ার মধ্যে ভিন্নতা আসতে পারে। অনেক দিন পূর্বের প্রদত্ত ফাত্ওয়া এখন উপযোগী নাও থাকতে পারে। একই বিষয়ের ফাত্ওয়া দু'স্থানে কিংবা দু'ব্যক্তির জন্য একই নাও হতে পারে। বিশেষ করে যে সকল ফাত্ওয়ার পক্ষে কোন সুস্পষ্ট দলীল নেই; বরং ইজতিহাদ, জনজীবনের কল্যাণ, মাসলাহা কিংবা কৃষ্টি-কালচার ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়। জনকল্যাণ কিংবা কৃষ্টি-কালচারে পরিবর্তন আসলে এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে এর উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত ফাত্ওয়াতেও পরিবর্তন আসতে পারে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: "ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা অতীব গুরুত্বপূর্ণ; অন্যথায় ভুল ফাত্ওয়া দেয়া কিংবা আল্লাহর শরীয়াতকে ভুল বুঝার মাধ্যমে মানুষ দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।" তিনি আরো বলেন: "এটাই স্বাভাবিক যে স্থান, কাল, অবস্থা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে ফাত্ওয়ার মধ্যে পরিবর্তন আসবে। মানুষের দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ, উপকার, শান্তি-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করাই হচ্ছে আল্লাহর শরীয়াতের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামের সকল বিধি-বিধানের লক্ষ্য হচ্ছে, সুবিচার প্রতিষ্ঠা, মানব কল্যাণ নিশ্চিত করা, মানব জীবন থেকে ক্ষতিকর বিষয়-বস্তুগুলো দূর করা ইত্যাদি। সুতরাং ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে যদি উপরোক্ত বিষয়টি লক্ষ্য করা না হয়, তাহলে শরীয়াতের মূল উদ্দেশ্যের বিপরীত ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।"[৯৭] ইসলামী আইনের একটি মৌলিক সূত্র হচ্ছে "এটাই স্বাভাবিক যে, সময়ের পরিবর্তনে হুকুম বা বিধানের মধ্যেও পরিবর্তন আসবে।"[৯৮]

৯৬. আল-ক্বারাফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯; মুহসিন সালিহ আদ-দাসূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
৯৭. ইবনুল কাইয়িম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫; ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৯৮. মৌলিক সূত্রটি হচ্ছে: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (It cannot be denied that changes in rulings follow changes in time) বিস্তারিত দেখুন : আযমান ইসমাঈল এবং মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *Islamic Legal Maxims, Essentials and Applications*, কুয়ালালামপুর : ইসলামিক ব্যাংকিং এ- ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট অফ মালয়শিয়া, ২০১৩, পৃ. ১০৯

৭. ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে সংঘটিত ভুল-ত্রুটি সমূহ[৯৯]

এক : শরীয়াতের মৌলিক দলীল সম্পর্কে উদাসীন হওয়া। অনেক সময় দেখা যায়, শরীয়াতের কোন মৌলিক দলীল তথা কুরআন কিংবা হাদীস নির্ভর দলীল ব্যতিরেকে শুধুমাত্র চিন্তা-গবেষণাপ্রসূত কোন যুক্তি বা অন্য কারো মতামতের উপর ভিত্তি করে ফাত্ওয়া দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে হাদীসের উপর বেশী অবিচার করা হয়। অনেক সময় দুর্বল কিংবা বানোয়াট কোন কথাকে হাদীস বলে চালিয়ে দিয়ে এর উপর ভিত্তি করে ফাত্ওয়া দেয়া হয়।

দুই : অপব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে ফাত্ওয়া দেয়া। ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, কুরআন কিংবা হাদীসের তথ্যসূত্র ঠিক থাকলেও এর ভুল ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে ফাত্ওয়া দেয়া হয়, যা ইতঃপূর্বে কোন স্কলার বলেননি কিংবা যা ইসলামের মৌলিক বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।

তিন : অনেক সময় দেখা যায় বাস্তবে যা ঘটেছে তার উপর ভিত্তি না করে উক্ত ঘটনাকে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে ব্যাখ্যা করে তারপর পছন্দমত ফাত্ওয়া দেয়া হয়ে থাকে, যা ইসলামে কখনো গ্রহণযোগ্য নয়।

চার : নিজের খেয়াল-খুশী মোতাবেক, অবস্থার চাপে কিংবা পার্থিব কোন কিছু লাভের আশায় ফাত্ওয়া দেয়া। ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে পূববর্তী যে কোন ফকীহদের মতামত গ্রহণ করতে পারবে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে সঠিকভাবে চিন্তা-গবেষণা করার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে কোন মতটি বর্তমান সমস্যার জন্য উপযুক্ত হবে। এ ক্ষেত্রে যদি নিজের মন-মর্জি কিংবা ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেই মাপকাঠি ধরা হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা হারাম হবে।[১০০]

ইমাম ক্বারাফী বলেন:

> কোন বিষয়ে যদি দু'টি মত থাকে, একটি কঠিন এবং অপরটি অপেক্ষাকৃত সহজ, এ ক্ষেত্রে কেউ যদি সাধারণ মানুষের জন্য কঠিন এবং বিশেষ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সহজ মতটির উপর ভিত্তি করে ফাত্ওয়া দেয়, তাহলে উক্ত ফাত্ওয়া গ্রহণযোগ্য হবে না, এবং এটি একটি পাপাচার হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের কাজ দীনের খেয়ানত কিংবা ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে খেল-তামাশা করার তুল্য, যা কখনো বৈধ নয়।[১০১]

পাঁচ : অনেক সময় দেখা যায়, প্রাচীন কোন ফাত্ওয়াকে আঁকড়ে ধরে এর উপর ভিত্তি করে বর্তমানে ফাত্ওয়া দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে যেটি করণীয় তা হচ্ছে, পূর্বে প্রদত্ত ফাত্ওয়া বর্তমানের পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করতে হবে, যদি তা

[৯৯]. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৮৫

[১০০]. ইবনুল কাইয়িম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৫৩

[১০১]. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

বর্তমানেও প্রযোজ্য হয় তাহলে সে অনুযায়ী ফাত্ওয়া দেয়া যাবে, অন্যথায় পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে বিদ্যমান ফাত্ওয়াটি হালনাগাদ করে নিতে হবে। তাইতো দেখা যায়, প্রশ্নকারীর অবস্থার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ স. একই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। এছাড়াও দেখা যায়, অবস্থার ভিন্নতার প্রেক্ষিতে ফকীহগণও একই সমস্যার সমাধান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। ইবনু আবিদীন বলেন:

> তাইতো দেখা যায়, পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমাদের মাযহাবের স্কলারগণ অনেক বিষয়ে মাযহাবের ইমাম তথা আবু হানীফার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন; কারণ তারা জানতেন, যদি তাঁদের ইমাম এখন বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনিও তাদের মতামতের সাথে একাত্মতা পোষণ করতেন।[১০২]

৮. ফাত্ওয়া জিজ্ঞেস করার ক্ষেত্রে প্রশ্নকারীর করণীয়

এক: প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশ্ন করা। যে সকল বিষয় ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির জন্য প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণকর এ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করা উচিত। বলা হয়ে থাকে, حسن السؤال نصف العلم অর্থাৎ সুন্দর প্রশ্ন জ্ঞানের অর্ধেক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾

> হে ঈমানদারগণ, তোমরা এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে প্রকাশ হলে তোমাদের খারাপ লাগবে।[১০৩]

রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

> আমি যে সকল বিষয়ে বলা থেকে বিরত থেকেছি সে সকল বিষয়ে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করো না; তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা বেশী বেশী প্রশ্ন করা এবং তাদের নবীদের সাথে দ্বিমত পোষণ করার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।[১০৪]

আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর কিভাবে আছেন এ বিষয়ে ইমাম মালিক রহ.-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলে রাগান্বিত হয়ে তিনি বলেন:

الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

[১০২]. ইবনু আবিদীন, নাশরুল আরফ ফিমা বুনিয়া মিন আল-আহ্কাম আলা আল-উরফ, *মাজমু'আত রাসায়েল ইবনে আবিদীন*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৫

[১০৩]. আল-কুরআন, ৫ : ১০১

[১০৪]. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অনুচ্ছেদ : ফারদিল হাজ্জ মার্‌রাতান ফিল উমর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০২, হাদীস নং-৩৩২১

আল্লাহ আরশের উপর আছেন এটা জানা বিষয়, কিভাবে আছেন এটা অজানা বিষয়, কিন্তু এর প্রতি বিশ্বাস থাকা আবশ্যক এবং এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদআত (ইসলামে নতুন ধারা)।[১০৫]

দুই: ফাত্ওয়া জানতে চাওয়ার ক্ষেত্রে প্রশ্নকারীর উচিত, সংশ্লিষ্ট বিষয় বা ঘটনাটি সত্যিকারভাবে মুফতীর সামনে উপস্থাপন করা। সাধারণত মুফতী তার সামনে উপস্থাপিত বর্ণনার আলোকেই ফাত্ওয়া দিয়ে থাকেন। তাই কোন বিষয়ের অবৈধতার ব্যাপারে প্রশ্নকারী যদি নিশ্চিত থাকে, অতঃপর ফাত্ওয়া ব্যবহার করে বৈধ করার লক্ষ্যে মুফতীর সামনে এটা কাটছাঁট করে উপস্থাপন করা তার জন্য জায়িয হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।[১০৬]

উম্মু সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا

তোমরা আমার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে মীমাংসার জন্য এসে থাকো, অবশ্যই যুক্তি-তর্ক পেশ করার ক্ষেত্রে তোমাদের কেউ কেউ অপরের চেয়ে বেশী ধূর্ত, আর আমিতো যা শুনি সে অনুযায়ীই মীমাংসা করি। সুতরাং তোমাদের বক্তব্য শুনে যদি আমি একজনের অধিকার অপরকে দিয়ে থাকি তাহলে তোমরা তা গ্রহণ করো না; যদি তা গ্রহণ করো তাহলে তা হবে জাহান্নামের আগুন ভক্ষণতুল্য।[১০৭]

তিন : মুফতীর নিকট কোন প্রশ্ন কিংবা কোন ঘটনা বর্ণনা করার সময় প্রশ্নকারীর উচিত, উক্ত প্রশ্ন বা ঘটনার সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে খুলে বলা, যাতে সব কিছু জেনে-শুনে মুফতী সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান দিতে সক্ষম হয়।[১০৮]

চার: কোন মুফতীর প্রদত্ত ফাত্ওয়া মেনে নেয়ার ব্যাপারে যদি প্রশ্নকারীর মানসিক প্রশান্তি না আসে, তাহলে তার উচিত নিজেকে নিজে প্রশ্ন করা, যদি তার সে যোগ্যতা

১০৫. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, ৪৫
১০৬. আল-কুরআন, ২ : ১৮৮
১০৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অনুচ্ছেদ : মান আকামা আল-বাইয়্যিনাহ বা'দ আল-ইয়ামিন, কায়রো, মাতবা'আ আল-আমিরিয়াহ, ১২৮৬ হিজরী, খ. ৯, পৃ. ৪৯১, হাদীস নং-২৬৮০
১০৮. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

থাকে; অন্যথায় তার উচিত অন্য কোন একজন বা একাধিক মুফতীর মতামত সংগ্রহ করা, যতক্ষণ না প্রশান্ত অন্তরে সে তা মেনে নিতে সক্ষম হয়। ইবনুল কাইয়িম বলেন: "কোন ফাত্ওয়ার ব্যাপারে যদি অন্তরে পরিতৃপ্তি না আসে এবং তা গ্রহণ করতে সন্দেহ-সংশয় থেকে যায়, তাহলে সে ফাত্ওয়া অনুযায়ী কাজ করা জায়িয হবে না; কারণ রাসূলুল্লাহ স. বলেন : استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস করো, যদিও মুফতীরা তোমাকে ফাত্ওয়া দিয়ে থাকে।[১০৯]

৯. ফাত্ওয়া কার্যকর ও বাস্তবায়ন

ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, আইনী সিদ্ধান্তের ন্যায় ফাত্ওয়া বল প্রয়োগ উপযোগী নয়; বরং শুধুমাত্র আল্লাহর বিধানের সন্ধানদাতা। মুফতীর দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর বিধান জানিয়ে দেয়া; এর বাস্তবায়ন নয়। যদি ফাত্ওয়ার মধ্যে বাস্তবায়নের কোন বিষয় থাকে, যেমন নাগরিক অধিকার প্রদান, অর্থসংক্রান্ত মীমাংসা, শাস্তি প্রদান ইত্যাদি, এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধি অথবা রাষ্ট্রীয় কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা ইনস্টিটিউশনকে এর বাস্তবায়ন করতে হবে। মুসলিম স্কলারদের সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তাঁর প্রতিনিধি ব্যতিরেকে অন্য কেউ ইসলামী আইনের কোন শাস্তি বাস্তবায়ন করতে পারবে না।[১১০]

এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ফাত্ওয়ার মাধ্যমে যে কোন শাস্তি (হুদূদ) বাস্তবায়ন ইসলামী আইনের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক, এবং ইসলামী আইনে শাস্তি প্রদানের যে দর্শন রয়েছে তার পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

ادرؤوا الحدود بالشبهات

কোন সন্দেহ-সংশয় থাকলে তোমরা হদ্দ বাস্তবায়নে বিরত থাক।[১১১]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعُقُوبَةِ

তোমরা যথাসম্ভব মুসলিমদের হদ্দ প্রদান রহিত কর, যদি শাস্তি এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় থাকে তাহলে তার মাধ্যমে অপরাধীকে মুক্ত করে দাও; রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য ভুল করে শাস্তি প্রদানের চেয়ে ভুল করে ক্ষমা করা অনেক উত্তম।[১১২]

১০৯. ইবনুল কাইয়িম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫৪
১১০. *আল-মাউসু'আহ আল-ফিক্হীয়্যাহ*, কুয়েত : ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯০, খ. ১৭, পৃ. ১৪৪
১১১. আহমদ ইবনে হুসাইন আল-বাইহাক্বী, *সুনান আল-বাইহাক্বী আল-কুবরা*, অনুচ্ছেদ : বায়ান ধা'ফিল খাবার আল্-লাযি রুইয়া ফি ক্বাতলি আল-মু'মিন, মাক্কাহ মুকার্‌রামাহ : মাকতাবাত দারুল বায, ১৯৯৪, খ. ৪, পৃ. ৩১, হাদীস নং-১৫৭০০

বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এ ধরনের যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয় রয়েছে, যার প্রেক্ষিতে কোন হদ্দ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বর্তমান সময়কালকে অনেকে ফিতনার যুগ, মূর্খতার যুগ, সন্দেহ-সংশয়ের যুগ ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। অনেকে ইসলামী বিধান না জেনে অপরাধ করে থাকে। অনেকে অভাব-অনটনে পড়ে অপরাধ করে থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের পদস্খলন ও চারিত্রিক অধঃপতন ঘটে থাকে। তাই দেখা যায়, রাসূলের স. মক্কার জীবনে হদ্দের বিধান অবতীর্ণ হয়নি; কারণ তখনকার সমাজব্যবস্থা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। খলিফা উমর রা. দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের প্রেক্ষিতে চুরির হদ্দ স্থগিত করেছিলেন; কারণ সেখানে এ সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, হয়ত অনেকে অভাবের কারণে চুরি করতে বাধ্য হয়ে থাকবে। সুতরাং কোন ব্যক্তির উপর শাস্তি বাস্তবায়নের পূর্বে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, সমাজ ও রাষ্ট্র উক্ত অপরাধ থেকে তাকে দূরে রাখার জন্য ইতিমধ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে।[১১৩]

উপরন্তু, হদ্দ বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী আইনে যে সকল শর্তাবলি আরোপ করা হয়েছে সেগুলোর প্রেক্ষিতে হদ্দ বাস্তবায়ন অনেকাংশে অসম্ভব। তাই অনেকে এ শর্তাবলির নামকরণ করছেন তা'জীযিয়্যাহ (تعجيزية), অর্থাৎ: অনেকটা বাস্তবায়নে বাধা প্রদানকারী এবং অক্ষমকারী শর্ত। যেমন: ব্যভিচারের হদ্দ প্রদানের জন্য চারজন সাক্ষীর সরাসরি অপরাধকর্মে লিপ্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে, যা অনেকাংশে অসম্ভব।[১১৪] তাই কোন ভিডিও রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে ব্যভিচারের অপরাধ প্রমাণ করে তার প্রেক্ষিতে শর'য়ী শাস্তি দেয়া যাবে না; কারণ তা নকল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, আর সম্ভাবনা হদ্দকে রহিত করে দেয়। এছাড়াও অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান না করার নির্দেশ এবং কারো দোষ ত্রুটি দেখার পর, যদি তার দ্বারা সামষ্টিক কোন ক্ষতি না হয়, তাহলে তা গোপন রাখতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

কেউ যদি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটিও দুনিয়া এবং আখিরাতে গোপন রাখবেন।[১১৫]

১১২. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অনুচ্ছেদ : দারয়ুল হুদূদ, বৈরুত : দারু ইহয়া আত্-তুরাছ আল-আরবী, তা.বি., তাহকীক : আহমদ শাকির প্রমুখ, খ. ৪, পৃ. ৩৩, হাদীস নং-১৪২৪

১১৩. আলী জুম'আ, *হাক্বায়িক্ব হাওলা তাতবীক আশ্-শারীয়াহ ওয়াল হুদুদ*, গ্রহণ : ২/৭/২০১৫। ওয়েবসাইট: http://www.onislam.net/arabic/madarik/cultureideas/90481alsharea.html

১১৪. সালিম আব্দুল জলিল, শুরূতু তাতীবক আল-হুদূদ তাকাদু তাকূনু তা'জীয়্যাহ, গ্রহণ : ২/৭/২০১৫। ওয়েবসাইট : http://gate.ahram.org.eg/News/165994.aspx

১১৫. ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, অনুচ্ছেদ : আস্-সাতরু আলা আল-মু'মিন ওয়া দাফ' আল-হুদূদ, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৯, হাদীস নং ২৬৪১

দলীল-প্রমাণ কিংবা যুক্তি-তর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণ করে কাউকে শাস্তি প্রদান করা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়; বরং শাস্তির বিধান দেয়ার মাধ্যমে মানুষের মাঝে অপরাধবোধ জাগ্রত করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট তাওবা করার শিক্ষা দেয়াই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। তাই দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ স. দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে অপরাধী প্রমাণ করে কাউকে শাস্তি দেননি; বরং বারংবার ফিরিয়ে দেয়ার পরও পরপর চারবার স্বীকারোক্তি পাওয়ার পর তিনি শাস্তি বাস্তবায়ন করেছিলেন। সেক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ স. বলেছিলেন: যদি তারা অপরাধের কথা গোপন রেখে আল্লাহর নিকট তাওবা করে নিত তাহলে তা যথেষ্ট হতো ।[১১৬]

মূলত ইসলামী আইনে শাস্তি প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরাধীকে ভয় প্রদর্শন, বারংবার অপরাধ করা থেকে বিরত রাখা, পরকালীন শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়া, ইত্যাদি। তাই স্বেচ্ছায় শাস্তি গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ স. তাদের ব্যাপারে বলেছিলেন:

لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ.

সে এমন তাওবা করেছে যদি তা পুরো উম্মতের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হতো তাহলে যথেষ্ট হতো।[১১৭]

ইসলামের শাস্তি প্রণয়নের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ। প্রখ্যাত ফিক্হী গ্রন্থ *'আল-ফাওয়াকিহ আদ্-দাওয়ানী'* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে:

الحد ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره، وفي معنى الحدود التعاذير، وحكمة مشروعيتها الزجر عن إتلاف ما حكى الأصوليون إجماع الملل على وجوب حفظه من العقول والنفوس والأديان والأعراض والأموال والأنساب؛ فإن في القصاص حفظا للدماء، وفي القطع للسرقة الحفظ للأموال، وفي الحد للزنا حفظ الأنساب، والحد للشرب حفظ العقول، وفي الحد للقذف حفظ الأعراض، وفي القتل للرده حفظ الدين، وقيل إن الحدود جوائز أي كفارات

বারংবার অপরাধ করা থেকে অপরাধীকে বিরত রাখা এবং অন্যান্যদেরকে তা থেকে ভয় ও ধমকীস্বরূপ ইসলামে হদ্দের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। অনুরূপ উদ্দেশ্যে তা'যীরের বিধানও প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলামে শাস্তির বিধানের অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে: যে সকল বিষয়গুলো সুরক্ষা করার আবশ্যকতার ব্যাপারে স্কলারগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন, ধ্বংস ও অবক্ষয় থেকে সেগুলোকে নিরাপদে রাখা। সে বিষয়গুলো হচ্ছে: মানুষের জীবন, বিদ্যা-বুদ্ধি, ধর্ম, মান-সম্মান, সহায়-সম্পত্তি এবং বংশ-পরিচয়। সুতরাং ক্বিসাসের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে মানুষের জীবনের সুরক্ষার জন্য, চুরির শাস্তি হচ্ছে সহায়-সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য, ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে বংশ-পরিচয় ঠিক রাখার জন্য, নেশা করার শাস্তি হচ্ছে

১১৬. বিস্তারিত ঘটনা পড়ুন: ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অনুচ্ছেদ : মান ই'তারাফা আলা নাফছিহি বিয্-যিনা, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১২০, হাদীস নং-৪৫২৮

১১৭. প্রাগুক্ত

মস্তিষ্কের সুরক্ষার জন্য, সতী নারীকে অপবাদ দেয়ার শাস্তি হচ্ছে মান-সম্মান নিরাপদ রাখার জন্য, এবং ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি হচ্ছে ধর্মকে নিঃশঙ্ক রাখার জন্য। বলা হয়ে থাকে: হুদূদ হচ্ছে কৃত অপরাধের কাফ্ফারা স্বরূপ।[১১৮]

চিত্র ০৪: ইসলামে শাস্তির বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যসমূহ [১১৯]

অনুরূপভাবে প্রখ্যাত উসূলবিদ আল-আমিদী (৫৫১-৬৩১ হি.) বলেন:

المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والال، فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من الضروريات.... أما حفظ الدين فبشرع قتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع، وأما حفظ النفوس فبشرع القصاص، وأما حفظ العقول فبشرع الحد على شرب الخمر

পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্য যেগুলো সুরক্ষা করার ব্যাপারে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন সেগুলো হচ্ছে ধর্ম, জীবন, মস্তিষ্ক, বংশ ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা। এ পাঁচটি বিষয় সুরক্ষা করা মৌলিক ও আবশ্যকীয় কর্তব্য। সুতরাং অবিশ্বাসী এবং ধর্মদ্রোহিতার দিকে আহ্বানকারীকে হত্যা করার বিধানের মাধ্যমে ধর্মের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে, ক্বিসাসের বিধানের মাধ্যমে মানব জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে, নেশা করার শাস্তির বিধানের মাধ্যমে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে, ইত্যাদি।[১২০]

১১৮. আহমাদ ইবনে গুনাইম আন-নাফরাওয়ী, *আল-ফাওয়াকিহ আদ্-দাওয়ানী আলা রিসালাত ইবনে আবী ইয়াযিদ আল-কাইরাওয়ানী*, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১৫ হিজরী, খ. ২, পৃ. ১৭৮

১১৯. লেখকের নিজস্ব চিত্রায়ণ

১২০. আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-আমিদী, *আল-ইহকাম ফি উসূল আল-আহকাম*, বৈরূত : দারুল কিতাব আরবী, ১৪০৪ হিজরী, খ. ৩, পৃ. ৩০০

সুতরাং ইসলামে শাস্তির বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সার্বিক জনকল্যাণ নিশ্চিত করা, অকল্যাণকে প্রতিহত করা, সম্ভাব্য সকল অপরাধ থেকে মানব সমাজকে সুরক্ষা করা, অপরাধীর সুবিচার নিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি মানুষের ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা।[১২১]

১০. উপসংহার ও সুপারিশ

ফাত্ওয়া মানব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যকীয় একটি বিষয়। বাংলাদেশে ফাত্ওয়া নিয়ে সময়ে সময়ে তুমুল বিতর্ক হতে দেখা যায়। ফাত্ওয়া নিয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের উপর্যুক্ত রায় এ সকল বিতর্ক বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে সহায়ক হবে। ফাত্ওয়া সংক্রান্ত উপর্যুক্ত রায় নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের জন্য একটি মাইলফলক। আমরা আশা করব, সুপ্রিমকোর্ট বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন অব্যাহত রাখবে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নয়ন, জ্ঞানের বিভিন্ন জটিল ও সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভের কারণে দু'এক ব্যক্তির পক্ষে সব বিষয়ের ইসলামী সমাধান দেয়া অনেকাংশে অসম্ভব। এছাড়াও মুফতী হওয়ার জন্য উপরে যে সকল জ্ঞানের আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এক ব্যক্তির মধ্যে এ সকল জ্ঞানের সমাহার হওয়া বর্তমানে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মত সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেকটা সম্ভবপর নয়। তাই ইসলামী ফিক্হ একাডেমি ওআইসি সহ প্রায় উল্লেখযোগ্য সকল স্কলারগণ বর্তমানে সামষ্টিক গবেষণা এবং সামষ্টিকভাবে কোন বিষয়ে ফাত্ওয়া দেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ লক্ষ্যেই মিসর, সউদি আরব, জর্দানসহ আরব ও ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে ফাত্ওয়া কাউন্সিল, ফাত্ওয়া প্রদানকারী সংস্থা ইত্যাদি গড়ে ওঠেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা বাংলাদেশেও ইসলাম ও বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ও কুশলীদের নিয়ে এ ধরনের একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করার জন্য সুপ্রিমকোর্ট বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগী হওয়ার জন্য সুপারিশ করছি। কেন্দ্রীয়ভাবে গঠিত এ কমিটি বাংলাদেশে দৈনন্দিন ও সময়ে সময়ে ঘটিত বিভিন্ন বিষয়ে ফাত্ওয়া দিবে, ফাত্ওয়া দেয়ার নীতিমালা প্রণয়ন করবে এবং ফাত্ওয়া নিয়ে সংঘটিত সমস্যাসমূহ পর্যবেক্ষণ করবে। আশা করি, এর মাধ্যমে ফাত্ওয়া সংক্রান্ত জটিলতা এবং সমস্যাবলি অনেকাংশে হ্রাস পাবে। তবে এ কমিটির যাতে অপব্যবহার এবং অপপ্রয়োগ না হয় সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে এবং এ লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত মুফতীর যোগ্যতা, দক্ষতা, ও ফাত্ওয়া প্রদানের নীতিমালা ইত্যাদির চর্চা ও প্রয়োগ পুরোপুরি নিশ্চিত করতে হবে।

১২১. আবদুল মালিক আবদুল মাজীদ, আগরাদুল উক্বুবাত ফি আশ-শারীয়াহ আল-ইসলামিয়াহ ওয়া মাদা ফায়েলিয়াতুহা ফিল 'উসূর আল-মাদ্বীয়াহ ওয়াল হাদীসাহ, *মাজাল্লাত আল-'উলুম*, ১৪৩৩ হিজরী, খ. ১১, পৃ. ১৮